হেমচন্দ্র

"কবিরা নিসর্গরূপে ধর্ম্মের পুরোহিত। তাঁহারা জগতী-স্বরূপ কার্য্যের ক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎকর্ত্তার সত্তা সংস্থাপন করেন। তাঁহারা মনুষ্যের নিকট ঐশিক ক্রিয়া প্রণালীর যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়া দেন। কবিরা নীরস অস্থিসার তত্ত্ব-শাস্ত্রের শরীরে আত্মার সঞ্চার করত তাহাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শোভিত করেন। তাঁহাদিগের উপদেশে আমরা অচেতন পদার্থ সকলকে সচেতন স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি।"—রঙ্গলাল।

—:*:—

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
M. A., F. S. S., F. R. E. S.
বিরচিত।

—০—

দ্বিতীয় খণ্ড।

(১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ—১৮৮২ খৃষ্টাব্দ)

কলিকাতা।

১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মানসী প্রেস

১৪এ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন

'হেমচন্দ্র—প্রথম খণ্ডে'র বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছিল যে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে। কিন্তু কতিপয় কারণে গ্রন্থখানি তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ করাই বিধেয় বলিয়া মনে হইল।

হেমচন্দ্রের কবি-জীবন তিনভাগে বিভক্ত করাই বোধ হয় স্বাভাবিক। প্রথম ভাগ—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—হেমচন্দ্রের কবি-জীবনের প্রভাতকাল। এই সময়ে তাঁহার প্রতিভার প্রথম বিকাশ। এই যুগের শেষভাগে—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে—কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিরোধানের পর, তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাঙ্গালার কবি-সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দ্বিতীয় ভাগ—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—হেমচন্দ্রের কবি-জীবনের মধ্যাহ্নকাল। এই সময়ে, অর্থাৎ 'বৃত্রসংহার প্রথম খণ্ডে'র প্রকাশ হইতে 'দশমহাবিদ্যা'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শক্তি সর্ব্বোচ্চ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে—তাঁহার প্রতিভা-রবি মধ্যগগনে উপনীত হইয়াছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে হেমচন্দ্রের কবি-জীবনের

অপরাহ্ন আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে, তাঁহার প্রতিভা-রবি অস্তাচলগামী হইয়াছে। পারিবারিক দুঃখ ও অশান্তির ঘন মেঘ তাঁহার প্রতিভা-সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণরশ্মি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে দেয় নাই। হেমচন্দ্রের শেষ-জীবনের সেই বিষাদময়ী কাহিনী আমরা তৃতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইব।

বর্ত্তমান খণ্ডেও স্থানে স্থানে লিপিপ্রমাদ ঘটিয়াছে। দুই একটি গুরুতর ভুল নিম্নে সংশোধিত হইল।—

৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে উমাকালী 'হিন্দুকলেজে' শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। 'হিন্দুকলেজের' পরিবর্ত্তে 'হিন্দুস্কুল' পঠিত হওয়া উচিত। ৪৩ পৃষ্ঠায় স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্সের উক্তি বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে উহা স্যর লন্সেলট স্যাণ্ডার্সনের উক্তি। ২৭৭ পৃষ্ঠায় এবং ২৭৯ পৃষ্ঠায় হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর নাম 'ইচ্ছাময়ী দেবী' লিখিত হইয়াছে। উক্ত নামের পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণমতী দেবী' পঠিতব্য। কৃষ্ণমতীর জননীর নাম ইচ্ছাময়ী। ইতি—

১।৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১লা ভাদ্র, ১৩২৭ } শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

স্চী পত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চিত্র সূচী

গ্রন্থকারের রচিত বা সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ

১। **মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ।** শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা এবং আর্টপেপারে মুদ্রিত ১৫ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

২। **রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।** শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ চৌধুরী লিখিত ভূমিকা এবং ৪৬ খানি দুষ্প্রাপ্য হাফটোন চিত্র সম্বলিত। স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ে বাঁধা মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

৩। **হেমচন্দ্র—প্রথম খণ্ড।** (১৮৩৮-১৮৭৫)—৩৬ খানি দুষ্প্রাপ্য হাফটোন চিত্র সম্বলিত। স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ে বাঁধা মূল্য দুই টাকা মাত্র।

৪। LIFE OF GRISH CHUNDER GHOSE the Founder, first Editor of the *Hindoo Patriot* and the *Bengalee* (with Portraits). Cloth Rs. 2/3 only.

৫। SELECTIONS FROM THE WRITINGS OF GRISH CHUNDER GHOSE. (with a Facsimile of his hand-writing) Royal 8vo, 693 pp., cloth Rs. 5 only.

৬। MEMOIRS OF KALI PROSSUNNO SINGH (with a Portrait) Rs. 1/8 only.



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

—*—

'ভারতভিক্ষা'—'বাজিমাৎ।'

ভারতে যুবরাজের শুভাগমন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সমগ্র ভারতবর্ষময় মহা-মহোৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল,—

> "চারিদিক যুড়ি বাজিল বাদন,
> বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
> অর্দ্ধ ভূমণ্ডল করি তোলপাড়
> ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।"

ভারতবর্ষ তাহার মলিন ও দীন বেশ পরিত্যাগ করিয়া উৎসবের বেশ পরিধান করিল,—

"শত শত শত উড়িছে পতাকা
ভুবন-বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আঁকা
নগরে নগরে কোটি অট্টালিকা
শোভিয়া, সুচারু অনন্ত কায়।

"ভাসিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া
দেব-অট্টালিকা সদৃশ শোভিয়া,
অর্ণবতরণী কেতনে সাজিয়া
কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়।

নদীনদকুল কেতনে সজ্জিত,
কোটি কোটি প্রাণী পুলকে পূরিত,
বিবিধ বসন ভূষণে ভূষিত
চাতকের ন্যায় তীরে দাঁড়ায়॥

কিসের এ উৎসব তাহা কি পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে? তবে জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের ভাষাতেই তাহা স্মরণ করাইয়া দিই,—

"যেই বৃট্যানিয়া কটাক্ষে শাসিয়া
অবাধে মথিছে জলধি-জল,
অসুর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া,
ভ্রমিছে যাহার সেনানীদল;

যে বৃটনবাসী আসি এ ভারতে
কামানে জ্বালিল বজ্রের শিখা
যার দর্পতেজ ভারত অঙ্গেতে
অনল-অক্ষরে রয়েছে লিখা,

জিনিল সমর যে ভীম-প্রহারী
ক্ষত্রিয় রক্ষিত ভরত-গড়,
মুদকি মুলতান করি খান খান
শিখ গলে দিল দৃঢ় নিগড় ,

হেলায়ে তর্জ্জনী লইল অযোধ্যা,
রাজোয়ারা যার কটাক্ষে কাঁপে,
প্রচণ্ড সিপাহী-বিপ্লবে যে বহ্নি
নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে

যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে,
হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়,
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে
ভারত-ভুবন আজি লুটায়—

সেই বৃটনের রাজকুল চূড়া
কুমার আসিছে জলধি পথে
নিরখিয়া তায় জুড়াইতে আঁখি
ভারতবাসীরা দাঁড়ায়ে পথে।”

'বৃটিশ-শাসিত ভারত ভিতরে"—ইতঃপুর্ব্বে আর এরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নাই। ভারতবাসীর কণ্ঠে এরূপ আনন্দধ্বনি বহুদিন শ্রুত হয় নাই। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড (তখন যুবরাজ 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্') এই সময়ে এদেশে শুভাগমন করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া Serapis নামক অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ইনি প্রথমে বোম্বাই নগরে পদার্পণ করেন। পরে ভারত-বর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া উক্ত বৎসর ২৩শে ডিসেম্বর দিবসে রাজধানী কলিকাতায় উপস্থিত হন। যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমনোপলক্ষে প্রসিদ্ধ ও অপ্র-সিদ্ধ প্রায় সকল কবিই কবিতাদি রচনা করিয়া রাজ-ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। যে মহাকবির বীণার সুরতরঙ্গ চিরদিন জাতীয় সুখে উচ্ছ্বসিত, জাতীয় দুঃখে বিমূর্চ্ছিত, জাতীয় গর্ব্বে উদ্বেলিত, জাতীয় দৈন্যে সংক্ষোভিত হইয়াছে, তাঁহার বীণা এই উপলক্ষে নীরব ছিল না। ভারত সঙ্গীতের স্বদেশপ্রেমিক কবি এই স্মরণীয় সময়ে "ভারত সঙ্গীতে"র মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় "ভারত-ভিক্ষা" গাহিয়াছিলেন।

'ভারত-ভিক্ষা'। যুবরাজের কলিকাতায় শুভা-



প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্

(পরে সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড)

(১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে)

গমনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে 'ভারতভিক্ষা' প্রকাশিত হয়। উহার প্রকাশ কালে 'কলিকাতা গেজেটে' নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়।—

পুস্তকের নাম—'ভারত-ভিক্ষা' বা India's petition. বাঙ্গালা কবিতা। গ্রন্থকার হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের লেনে রায় প্রেসে বাবুরাম সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও বিপিনবিহারী রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৭৫। পত্রসংখ্যা ১৮, অক্টেভো। প্রথম সংস্করণ ১০০০ ছাপা হইল। মূল্য দুই আনা। গ্রন্থ সত্ত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর। মন্তব্য—On the visit of the Prince of Wales to India and the desire of its inhabitants that he may convey back to his mother the Queen, correct accounts of this country."

'ভারতসঙ্গীতে'র ন্যায় 'ভারতভিক্ষা'র সুর কবির হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত। যখন সকলে উৎসবের উল্লাসে উন্মত্ত, যখন মহাসমারোহে ভারতবর্ষকে সুসজ্জিত করিয়া তাহার দৈন্য আচ্ছাদিত করি-

বার চেষ্টা হইতেছিল, যখন উচ্চ আনন্দধ্বনির মধ্যে ভারতবর্ষের অন্তরের বেদনার করুণ সুর শ্রুত হইতেছিল না, তখন স্বদেশপ্রেমিক কবির কর্ণে "মায়ের সে মানসের ধ্বনি" শ্রুত হইয়াছিল এবং তাঁহার হৃদয়কে অব্যক্ত বেদনায় ব্যথিত করিয়াছিল। 'বৃত্রসংহারে'র কবি লিখিয়াছেন—

"জননী ভাবেন যদি. সে ভাবনা, গিরি, নদী,
ভেদি, সুতে করে আকর্ষণ"

—একথা সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। অধঃপতনের পাতাল হইতে কয়জন সন্তান মায়ের আহ্বানবাণী শুনিতে পায়? মায়ের বাণী শুনিতে পাইবারও অধিকার সকলের নাই। মায়ের যথার্থ উপযুক্ত সন্তান যাঁহারা—তাঁহাদেরই কর্ণে "মায়ের সে মানসের ধ্বনি" শ্রুত হয়। সেই জন্য যে স্বদেশবৎসল কবি যথার্থই জন্মভূমিকে স্বর্গ হইতে গরীয়সী বলিয়া মনে করিতেন, তিনিই মায়ের সে অন্তরের বাণী শুনিয়াছিলেন এবং দেশবাসীকে শুনাইয়াছিলেন। সে বাণী আর কোনও কবির বীণায় ঝঙ্কৃত হয় নাই।

যুবরাজ আসিয়াছেন, দেশের যাহা কিছু সুন্দর,

যাহা কিছু মূল্যবান, যাহা কিছু সুখকর, যাহা কিছু প্রীতিপ্রদ তাহাই তাঁহাকে প্রদর্শিত হইতেছে। যাঁহাকে ভবিষ্যতে কোহিনুর-খচিত মুকুটের সহিত কোটি কোটি প্রজার ভার গ্রহণ করিতে হইবে, সুখ দুঃখের কথা ভাবিতে হইবে, তাঁহাকে কি ভারতবর্ষ তাহার যথার্থ অবস্থা বা অভাবের কথা জানাইবে না? ভারত-সম্রাজ্ঞীকে কি ভারতবর্ষের কোনও দুঃখের কথা জানাইবার নাই? দেশের দুর্দ্দশায় যে দেশপ্রাণ কবির কোমল হৃদয় নিরন্তর অব্যক্ত বেদনায় ব্যথিত হইয়াছে, তাঁহার মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। আনন্দের দিনেও কবির নয়নের অশ্রু মুছিয়া যায় নাই। উৎসবের দিনেও সেই জন্য কবি দেশ-জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

> দেখাও, জননী, * * *
> দেখাও চিরিয়া ক্ষত বক্ষঃস্থল,
> দিবানিশি সেথা কি শোক জাগে।

যে দেশ অতীতে "জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল," যে দেশ "আগে ছিল রাণী, ধরা-রাজধানী"—তাহার পক্ষে যে উত্তর সম্ভব, ভারতমাতা তাঁহার প্রিয়পুত্র হেমচন্দ্রকে সেই উত্তর দিয়াছিলেন। "মায়ের সে মানসের

ধ্বনি”—সে মর্ম্মস্পর্শিনী বাণী—‘ভারতভিক্ষা’র কবির বীণায় অপূর্ব্ব ভাবে ঝঙ্কৃত হইয়াছে—

“কেন রে এখানে আসিছে কুমার?
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার!
কি দেখিবে আর—আছে কি সে দিন?
ভ্রূভঙ্গি করিয়া ছুটিত যেদিন
ভারত সন্তান নৈঋত ঈশান,
মুখে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান,
জাগায়ে মেদিনী গায়িত গাথা!
ভারত-কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত জীবনে জগত-জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র-আলোচন,
আছিল যখন ষড় দরশন···
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে, পূজিত সকলে,
ফিনিক সিরীয় যুনানী-মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক যথা।
ছিল যবে পরা কিরীট কুণ্ডল,
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—
আছিল রুধির আর্য্যের শিরায়
জ্বলন্ত অনল-সদৃশ শিখায়,

জগতে না ছিল হেন সাহসী
যাইত চলিয়া দেহ পরশি ,
ডাকিত যখন 'জননী' বলিয়া
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি উঠিত ছুটিয়া ,
ছিলাম তখন জগৎ-মাতা !

*　　*　　*

পূর্ব্ব সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরিশেরও দেখি জীবন-সঞ্চার
আমি কি একাই পড়িয়া রব ?
কি হেন পাতক করেছি তোমায় ?
বল্ ওরে বিধি বল্ রে আমায় ?
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হব !
হা রোম, —তুই বড় ভাগ্যবতী ।
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছিন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু-সমাবৃত
দেউল মন্দির রঙ্গ-নাট্যশালা
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু, পয়োনালা
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল !

মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষঃ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ নিকেতন,
রাখিলা মহীতে—কলঙ্ক-মণ্ডিত,
কাশী, গয়াক্ষেত্র, চণ্ডাল-ঘৃণিত
(শরীরে কালিমা—দীনতা-প্রতিমা)
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল।

হায় পাণিপথ, দারুণ প্রান্তর !
কেন ভাগ্য সনে হলিনে অন্তর ?
কেন রে চিতোর তোর সুখনিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হলি—কেন রে রহিলি
জাগাতে ঘৃণিত ভারত নাম ?

নিবেছে দেউটি বারাণসী তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর
লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ
পূর্ব্বকথা কিরে সকলি ভুলেছ ?
অরে অগ্রবন, সরযূ পাতকী,
রাহুগ্রাস-চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মাখি
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?

নাহি কি সলিল, হে যমুনে গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে,

কর অপস্থত এ কলঙ্ক-রাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারত ভুবন ভাসাও তলে ?
হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল জলে ?”

কবি ভারতমাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—

“কেঁদনা কেঁদনা আর গো জননী
মহিষীনন্দন কোলেতে এল,
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল ;
মহিষী তোমার যাহার আশ্রয়ে
এ শোক সহিয়া আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব অশ্রু মুছাইতে,
আপন নন্দনে বিদায় দিয়ে।”

ভারতমাতা তখন যুবরাজকে ক্রোড়ে লইয়া যে প্রার্থনা জানাইলেন তাহা ভারতমাতার উপযুক্ত। তিনি তাঁহার সন্তানের জন্য স্বাধীনতা ভিক্ষা করেন নাই, স্বায়ত্ত শাসন প্রার্থনা করেন নাই। মানুষের নিকট মানুষের

যাহা প্রাপ্য, ভারতমাতা বৃটিশ জাতিকে বিজেতার দাম্ভিকতা ও অহঙ্কার পরিহার করিয়া তাঁহার অতীত-গৌরবগর্ব্বিত সন্তানদিগের জন্য সেই স্নেহ, প্রীতি ও সহানুভূতি মাত্র প্রার্থনা করিয়াছেন। সে প্রার্থনায় দীনতা নাই—ওজস্বিতা আছে। তাঁহার প্রার্থনা—

ভুলিয়া বারেক বৃটিশ গর্জ্জন,
        ভারত সন্তানে ক্রোড়েতে ধর।
কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর,
নহে তুচ্ছ কীট—এদেরও অন্তর,
দয়া, মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়,
মান, অভিমান, জ্ঞান, ভক্তিময়—
এদেরও শরীরে শিরায় শিরায়
বহে রক্ত স্রোত,—বাসনা-তৃষায়
        ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে;

এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদ-গান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
        দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।

হেমচন্দ্র

এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড নশ্বর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ সন্তানে !
সমর-হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশ মণ্ডল
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে ;

যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি,
শুনাইল ধীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্তো
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্যে,—
তখন (ও) তাহারা ঘৃণিত নহে ;

তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্ব পানে কভু গর্ব্বে চায়—
এ জাতি কখন জঘন্য নহে ;

হে কুমার মনে রেখো এই কথা
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা
পবিত্র সে দেশ,—পূত-কলেবর—
কোটি কোটি প্রাণী, ঋষি পুণ্যধর,
কোটি কোটি জন শূর বীর নর,
কবি কোটি কোটি মধুর-অন্তর,
রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে!

ভারত মাতার প্রার্থনা,—

"নয়নের জল মুছারে আমার,
ভারত-সন্তানে লয়ে একবার
ভাই বলে ডাক্, হৃদি জুড়ায়।"—

বিফল হয় নাই। ন্যায়পরায়ণ বৃটিশজাতির নিকট ভারতবাসী স্নেহ ও সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হয় নাই। সেই সপ্তম এড্ওয়ার্ডের পুত্র আমাদের অতুলপ্রতাপান্বিত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ স্বয়ং আসিয়া ভারতবর্ষকে বলিয়া গিয়াছেন,

"Sympathy shall be the key-note of our rule."

এবং এই মন্ত্র অনুসারে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়া তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের কোটি কোটি অধিবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছেন!

যুবরাজের আগমনোপলক্ষে যে সকল কবিতা রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে হেমচন্দ্রের 'ভারত-ভিক্ষা' যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা বলা বাহুল্য। সাময়িক কবিতা হইলেও 'ভারতভিক্ষা' বঙ্গসাহিত্যে চিরদিন উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনও এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে তিনি 'আমার জীবনে' লিখিয়াছেন ঃ—

"এই সময়ে ইংলণ্ডের যুবরাজ (বর্ত্তমান সম্রাট্) ভারত দর্শনে শুভাগমন করেন। সেই উপলক্ষে হেমবাবু হইতে ছোট বড় সকল কবিগণ কবিতা লিখিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। কাণ পাতিবার যো নাই। কিন্তু আমি এরূপ 'হুজুগে' কবিতা কখনও লিখি নাই। এবারও লিখিলাম না। এমন সময়ে বিলাতের Crown Perfumery Co. ভারতীয় ও ইংরাজী ভাষায় তিনটা কবিতার জন্য তিনটা পারিতোষিক ঘোষণা করিলেন। আমার বন্ধু মুন্‌সেফ পি, এন, (প্রাণনাথ) বানার্জ্জি উহার বিজ্ঞাপন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় দেখিয়া আমাকেও একটি কবিতা লিখিতে জিদ করিলেন। সকলের ধারণা এরূপ হইল যে যুবরাজের কি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে এই ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে।



কবিবর নবীনচন্দ্র সেন

প্রাণনাথ আমার পরম বন্ধু। তাঁহার অনুরোধে ও তাড়নায় অগত্যা আমিও এক কবিতা লিখিয়া তাঁহার কৃত ইংরাজী অনুবাদ সহ বিলাতে পাঠাইলাম। উহার নাম 'ভারত-উচ্ছ্বাস'। প্রথম পারিতোষিক পঞ্চাশ গিনি আমি পাইলাম। উক্ত কোম্পানি আড়াই শত কি তিন শত কবিতা ভারত ও বিলাত হইতে পাইয়াছিলেন। তাহা হইতে আটটি কবিতা বাছিয়া গুণানুক্রমে একখানি বড় সুন্দর বহিতে ছাপিয়াছিলেন। প্রথম আমার কবিতা, দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র অঞ্চলের একটি সংস্কৃত কবিতা, এবং তৃতীয় বিলাতের একজন ইংরাজের একটি ইংরাজী কবিতা মুদ্রিত করিয়াছিলেন।"

ইংলণ্ডে অনেক সাহিত্য-সমাজ আছে কিন্তু বোধ হয় Crown Perfumery Coর ন্যায় সাহিত্যের (বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের) সমজ্‌দার সমবায় আর ছিল না কিম্বা কখনও হইবে না! এরূপ বিখ্যাত সমবায় কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হওয়ায় নবীনচন্দ্র সেনের ন্যায় কবি নিশ্চয়ই যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন! তবে দেশবাসী যে হেমচন্দ্রের 'ভারতভিক্ষা'কে নবীনচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন, যে 'হুজুগে' কবিতাটি চিরদিন দেশবাসীর হৃদয় স্পন্দিত

ও আলোড়িত করিয়াছে ও করিবে, তাহার বিষয় একটু শ্রদ্ধা,—একটু সহৃদয়তার—সহিত উল্লেখ করিলে বোধ হয় নবীনচন্দ্রের অগৌরব হইত না। প্রসিদ্ধ দেশ-প্রেমিক পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্য্যদর্শনে'র এক সংখ্যায় ভারতবর্ষে যুবরাজের আগমনোপলক্ষে রচিত কবিতাগুলি একটি সম্পাদকীয় সন্দর্ভে সমালোচিত হয়। তাহাতে নবীনচন্দ্রের 'ভারত-উচ্ছ্বাস' শীর্ষক পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতাটি সম্বন্ধে সমালোচক বলেন :—

"এখানি অবকাশরঞ্জিনী ও পলাশীর যুদ্ধের রচয়িতার সম্পূর্ণ অযোগ্য। নবীন বাবুর অমৃত-নিস্যন্দিনী লেখনী হইতে যে এরূপ অসার কবিতা গ্রন্থ প্রসূত হইবে তাহা আমরা কখন মনেও ভাবি নাই। বোধ হয় রাজকর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তি এ উপলক্ষে সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এ অবস্থায় তাঁহার এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া নবীন যশঃ কলঙ্কিত করা উচিত ছিল না।"

উক্ত সন্দর্ভে হেমচন্দ্রের 'ভারতভিক্ষা' সম্বন্ধে লিখিত হয়ঃ—

"এই উপলক্ষে যে কয়খানি কবিতাগ্রন্থ বাহির

হইয়াছে তন্মধ্যে হেমবাবুর 'ভারতভিক্ষা' সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হেমবাবুর তেজস্বিনী কবিত্বশক্তি কিয়ৎ পরিমাণে ইহাতেও পরিব্যক্ত হইয়াছে। শব্দগুলি যেন স্রোতের জলের ন্যায় টল্ টল্ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার পূর্ণ কোরসগুলি যেন পাঠকগণের মনকে পূর্ণ আনন্দে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। ভারত ভিক্ষার স্থানে স্থানে অতি চমৎকার সোৎপ্রাসোক্তি পরিদৃশ্যমান হয়।"

এই দেশপ্রসিদ্ধ কবিতাটি সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয়ের বিদুষী ভগিনী, সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিতা, শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা সরকার মহোদয়া এই কবিতাটি সম্বন্ধে একস্থানে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলাম :—

"গীতি কবিতায় হেমচন্দ্র অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি যে গীতি গাহিয়া গিয়াছেন, আর এখন সে গীতি কে গাহিবে? গীতি কবিতায় তিনি তাঁহার নির্ভীক, স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হৃদয়ের যে তীব্র জ্বালা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আগ্নেয় গিরির অগ্নিস্রোতের মত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।" পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, গীতি কবিতায় হেমচন্দ্রের অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে; তাঁহার সময়ে এই সকল কবিতার তীব্র উন্মাদিনী শক্তিতে কি খর স্রোত উৎপন্ন হইয়াছিল! আমাদের মতে ভারত ভিক্ষা তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা। এই কবিতা যেদিন প্রথম প্রকাশিত হইল, সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। তখন বালিকা ছিলাম, রাজকুমারের রাজধানীতে আগমন উপলক্ষে যে মহোৎসব হইয়াছিল, তাহাই দেখিতে পিতার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম; যাইবার সময় বাবা সঙ্গে একখানি ভারতভিক্ষা কিনিয়া লইয়াছিলেন। বাড়ীতে পৌছিয়া যখন তিনি আমাকে ভারতভিক্ষা প্রথম পড়িয়া শুনাইলেন, তখন আমার মনে যে কি অপূর্ব্ব ভাবরাশির অবিরাম তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তাহা কি বলিব। মনে পড়ে, শুনিয়া গিয়া আমি বিছানায় মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম। কেন? তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার হৃদয়ের আবেগ আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে যে দারুণ আঘাত করিয়াছিল, তাহা ধারণ করিতে পারি নাই বলিয়াই বোধ হয়, কাঁদিয়াছিলাম। ভারত ভিক্ষা বুঝিতে পারি, এমন বিদ্যা ও জ্ঞান আমার তখন ছিল না; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, সেইদিন হইতেই আমি

হেমচন্দ্রের একজন ভক্ত হইয়া গেলাম। ভারত-ভিক্ষাই আমার তখন একমাত্র জপমালা হইয়া উঠিল। অজয়ের নির্জ্জন তীরে ও বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কতবার যে কবিতাটী পড়িলাম, তাহার সংখ্যা হয় না। এইরূপে দুই দিনেই সমুদয় কবিতাটী আমার কণ্ঠস্থ হইল। পরে বড় হইয়া আরও অনেক কবিতা ও কাব্য পড়িয়াছি, কিন্তু আর কোন কবিতা আমাকে এমন মুগ্ধ ও উন্মত্ত করিতে পারে নাই। জন্মভূমি যে কি পদার্থ, আমাদের ভারত যে স্বর্গ হইতেও গুরুতরা, তাহা সেই বালিকা বয়সে এই কয়েক পংক্তি পড়িয়াই জন্মের মত শিখিয়া গেলাম,—

*　　*　　*　　*

আমাদের ভাষায় ইহা অপেক্ষা মর্ম্মভেদী ও দারুণ শোকগীতি রচিত হইয়াছে কি না জানি না।”

‘দাঁত ভাঙ্গা কাব্য।’ আমরা এ পর্য্যন্ত হেমচন্দ্রের যে সকল কবিতা বা কাব্যের পরিচয় লিপি-বদ্ধ করিয়াছি তাহাতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে কি বীররস, কি রৌদ্ররস, কি করুণ রস, কি শান্ত রস সকল প্রকার রসের অবতারণা করিতেই তিনি সিদ্ধহস্ত

ছিলেন। কেবল হাস্য রস সম্বলিত কোন রচনার কথা এ পর্য্যন্ত বলা হয় নাই। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে রহস্যালাপে হেমচন্দ্র পশ্চাৎপদ ছিলেন না, কোন মজ্‌লিসে বা সভায় তিনি বিদ্যাসাগর ও দীনবন্ধুর ন্যায় হাসির তুফান তুলিতে পারিতেন। রহস্য কবিতা রচনায়ও হেমচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন। বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশিগণকে পত্র লিখিতে হইলে প্রায়ই তিনি হাস্য-রস সম্বলিত পয়ারের আশ্রয় লইতেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই সকল পত্রাদি এখন পাওয়া যায় না। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বনামধন্য শিশির-কুমার ঘোষ মহাশয়ের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মৃণাল-কান্তি ঘোষ মহাশয় বলেন যে, শিশির বাবুর সহিত হেমচন্দ্রের আলাপ হইবার পর অমৃতবাজারের কোন পুরাতন সংখ্যায় হেমচন্দ্র 'দাঁতভাঙ্গা কাব্য' নামক একটি হাস্যরসপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত করেন। উহাতে "আমার শিশির ভাই, তাঁহার আদেশে গাই' এইরূপ ভনিতা ছিল। আমরা আজিকালি বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেক দাঁতভাঙ্গা কাব্য দেখিতে পাই বটে, কিন্তু যাঁহার কাব্য প্রসাদগুণের জন্য সর্ব্বত্র সমাদৃত সেই হেমচন্দ্রের 'দাঁত-ভাঙ্গা কাব্য' খানি কিরূপ তাহা দেখিবার আমাদিগের

যথেষ্ট কৌতূহল আছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এ পর্য্যন্ত উক্ত কাব্যটি আমাদের দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। আশা করি ভবিষ্যতে কেহ এই কাব্যটি উদ্ধার করিয়া আমাদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবেন।

'ভারত ভিক্ষা'র অব্যবহিত পরেই হেমচন্দ্র একটি অপূর্ব্ব প্রহসন কবিতা রচনা করেন। তাহার বিষয় পরে বিবৃত হইতেছে।

'বাজি মাৎ।' পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর দিবসে যুবরাজ (পরে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি রাত্রিকালে তিনি কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর 'জেনানা' দেখিতে বোধ হয় যুবরাজের ইচ্ছা হয়। * হাইকোর্টের জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট

* January 3rd, 1876. How it came about I do not exactly know, but it is probable that the Prince expressed a wish to see the zenana of some respectable native; and that the wish was made known to the worthy Hindoo of Bhowani-

শ্রীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর তখন বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি

---

pore, Mr. Mookerjee, who was only too happy to gratify it to-day. Miss Baring, Lady Temple, Miss Milman, Lady Stuart Hogg and others, had perhaps, some part in the POUR-PARLERS. There were hundreds of children assembled to see the Prince arrive; most of the little ladies held pretty bouquets, with which, out of loyal devotion, to pelt the Prince. These children may develop into Hindoo Bloomers and establish Women's Rights Associations, unless their wild shrieks of liberty be silenced in the leaden flood of caste and custom which has drowned so much thought and life in India century after century. Instead of salutes and flourishes or bell-pulling, the Hindus use conchs to announce the arrival of guests: the noise of these natural horns makes one rejoice that he is not among the Tritons. These were sounded often and long, for there were false alarms of the Prince's coming; but at last his carriage came in sight, and there was much conch-blowing. His Royal Highness did not appear in the splendid attire which Mrs.

যুবরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ৩রা জানুয়ারি সন্ধ্যাকালে যুবরাজকে ভবানীপুরে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং যুবরাজও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যুবরাজকে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারস্থ মহিলাগণ অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এই ব্যাপার লইয়া সে সময়ে হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন হয়। যদি মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই উদারমতাবলম্বী হইতেন এবং পরিবারস্থ মহিলাগণকে সুশিক্ষিতা করিয়া অবরোধ মুক্ত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এত গোলযোগ হইত না। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী অনেক ভদ্রব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাদের পরিবারস্থ মহিলাগণকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। তাহাতে কেহই তাঁহাদের কার্য্যে কটাক্ষপাত করেন নাই। কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় ত তাঁহার

Mookerjee and her fair friends, no doubt, thought a Prince should wear. Whether Baboo Jugadananda Mookerjee will over get over the wrath of his co-religionists for the doings of this day, time only can show. * * *—'Prince of Wales' Tour. A Diary in India by William Howard Russell. London 1877.

পরিবারস্থ মহিলাগণকে অবরোধ মুক্ত করেন নাই।

অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে কোন উচ্চ পদ বা উপাধিলাভের আশায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু সমাজের অননুমোদিত এইরূপ কার্য্য করিতেছেন। তৎকালীন সমস্ত সংবাদ পত্রে তাঁহার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কি এতদ্দেশীয় ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রাদিতেও রক্ষণশীল হিন্দুদিগের প্রতিবাদপূর্ণ যুক্তির সারবত্তা স্বীকৃত হইয়াছিল।

৩রা জানুয়ারির (২০ শে পৌষের) ঘটনার পর হাইকোর্টে উকীল লাইব্রেরীতে এই ব্যাপার লইয়া মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট-প্লীডার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেমন অতি আচারনিষ্ঠহিন্দু * ছিলেন তেমনই পরিহাস-রসিক ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে যেমন ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন তেমনই এই ব্যাপার

---

* বয়েসও হয়েছে কিছু, বুদ্ধিও পেকেছে।
ছোট বড় কর্ম্ম কাজ অনেক করেছে॥
পাকা হিন্দু, প্রতিদিন দুর্গানাম করে।
ইত্যাদি—'বাজিমাৎ'।

লইয়া ব্যঙ্গ কৌতুকও করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রের রহস্যকবিতা রচনার ক্ষমতা তিনি জানিতেন, তিনি কেবলই হেমচন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়া বলিতে লাগিলেন "হেম, তুই এই নিয়ে একটা কিছু লেখ্ না।" এই অনুরোধ ও উত্তেজনার ফলে হেমচন্দ্রের 'বাজিমাৎ' রচিত হয়।

'বাজিমাৎ' বন্ধুমহলে পঠিত হইবে এই জন্যই লিখিত হইয়াছিল। উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে কবির বোধ হয় এরূপ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া অন্যরূপ হইয়া গেল।

শ্যামবাজার নিবাসী ৺গোপাললাল মিত্র মহাশয় হেমচন্দ্রের একজন বন্ধু ছিলেন। গোপাললাল ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। সেকালের শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট প্রভৃতিতে তাঁহার পরীক্ষার উত্তর পত্রাদি মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি উকীল হন এবং হাইকোর্টেই হেমচন্দ্রের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। গোপাললাল অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং ছুটীর দিন হেমচন্দ্র প্রমুখ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার বাটীতে আসিয়া সাহিত্যা-



গোপাললাল মিত্র

লোচনা করিতেন। গোপাললাল পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান-রূপে কার্য্য করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রিল তারিখে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

গোপাললাল হেমচন্দ্রের বাজিমাৎ পড়িয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই উক্ত কবিতাটি শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট লইয়া যান এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় উহা প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করেন। অমৃতবাজারে এই বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ছাপা হইতেছিল। শিশিরকুমার 'বাজিমাৎ'টিও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি (৭ই মাঘ ১২৮২ বঙ্গাব্দে বৃহস্পতিবার) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া সম্পাদকীয় সন্দর্ভে লিখিলেন :

"We are sorry we cannot publish the letters that we have received regarding the Bhowanipur affair. They are so many that we cannot find place for them, neither do we chose to carry the matter further. We have been obliged to make room for

a lengthy burlesque on the subject by the intercession of friends whom we cannot disoblige and because the piece is from the pen of one of the best poets of Bengal. etc. etc."

'বাজিমাৎ' প্রকাশিত হইবার সময়ে উহার নিম্নে হেমচন্দ্রের স্বাক্ষর ছিল না। 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' 'প্রেরিত' বলিয়া উহা প্রকাশিত হয়।

যেদিন অমৃতবাজারে উহা প্রকাশিত হইল সেইদিন হাইকোর্টে বার লাইব্রেরীতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গোপাললাল মিত্র মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিলেন ঃ—

'বেঁচে থাকো মুখুর্য্যের পো' ইত্যাদি

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন,—

"I happened to be present in the Calcutta High Court on the day on which the poem বাজিমাৎ written after the visit of the late King to the house of the late Babu



মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

Jugadanand Mukherji appeared in the Amrita Bazar Patrika. It was read out by the late Babu Gopal Lal Mitra, who afterwards became Vice-Chairman of the Calcutta Municipal Corporation. Babu Jugadanand was very much displeased as I happen to know."

গোপাল বাবুর 'বাজিমাৎ'-পাঠের সময় বার লাই-ব্রেরীতে যে উচ্চ হাস্যরোল উত্থিত হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয় কিন্তু সহজেই অনুমেয়। বলা বাহুল্য অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখকের নাম প্রকাশিত না হইলেও, লেখকের নাম কাহারও নিকট অবিদিত রহিল না। জগদানন্দ হেমচন্দ্রের উপর মহা ক্রুদ্ধ হইলেন। শুনা যায় তিনি হেমচন্দ্রের নামে মান-হানির মোকদ্দমা করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল পুরাতন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"যখন রব উঠিল যে, জগদানন্দ বাবু হেমবাবুর নামে নালিশ করিবেন, এবং গভর্ণমেণ্ট জগদানন্দবাবুকে সাহায্য করিবেন, তখন হেমবাবু অত্যন্ত ভয় পাইয়া-

ছিলেন। কথাটা নেহাৎ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে; কারণ সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে নিশ্চয়ই কথাটার কোনও ভিত্তি আছে।”

শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় বলেন যে তিনি শুনিয়াছিলেন, জগদানন্দ বাঙ্গালার তদানীন্তন এড-ভোকেট জেনারেল স্যর চার্লস পলের নিকট পরামর্শ লইতে গিয়াছিলেন যে হেমচন্দ্রের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা হইতে পারে কি না। স্যর চার্লস তাঁহাকে কবিতাটির একটা ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইয়া দিতে বলেন। বলা বাহুল্য ইংরাজী অনুবাদে উহার শ্লেষ-পূর্ণ আপত্তিকর অংশগুলির যথাযথ পরিচয় পাওয়া গেল না। স্যর চার্লসও উহা নির্দ্দোষ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে নীরবেই বাজিমাতের কবির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ সহ্য করিতে হইল।

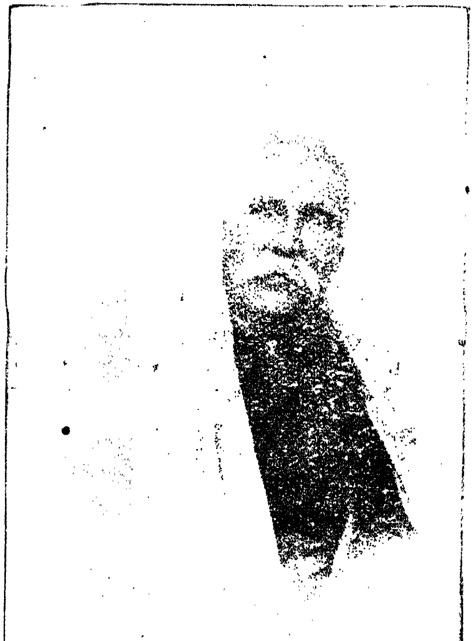
হেমচন্দ্রের রচনার একটি বিশেষ গুণ এই যে, সাময়িক ঘটনাবলম্বনে রচিত কবিতাগুলিতেও এমন চিরন্তন রস নিহিত আছে যে সেগুলিও সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করিয়াছে। পরলোকগত স্যর গুরুদাস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার মতে “হেমবাবু



সুশীলা দেবী

প্রহসন কবিতাগুলির মধ্যে 'বাজিমাৎ' সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" এ বিষয়ে অনেকেই স্যর গুরুদাসের সহিত একমত হইবেন সন্দেহ নাই।

জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ। এই সময়ে হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলা দেবী বিবাহযোগ্যা হন। বিখ্যাত ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার এবং পরে কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সুশীলা দেবীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়। গোপালবাবুর সহধর্ম্মিণী, হেমচন্দ্রের বন্ধু উত্তরপাড়া নিবাসী বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি স্যর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অতি নিকট সম্পর্কীয়া ভগিনী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ বামাচরণ বাবুর মধ্যবর্ত্তিতায় এই সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পর একটি দুর্ঘটনায় গোপালবাবুর এক বালক পুত্রের মৃত্যু হয়, এবং অনেকে কন্যা 'অপয়া' বলিয়া গোপাল বাবুকে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ গোপালচন্দ্র কথা দিয়া ভাঙ্গিবার লোক ছিলেন না। যথাসময়ে বিনোদবিহারীর সহিত সুশীলা



রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

দেবীর বিবাহ হয়। হেমচন্দ্র এই ঘটনার জন্য গোপালচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং পরে তাঁহার অপর এক পুত্রের সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন। সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। হেমচন্দ্রের পুত্রগণ কেহই পিতার উপযুক্ত হন নাই, সেই জন্য জ্যেষ্ঠ জামাতাকে তিনি পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। বিনোদবিহারী সৈন্যসংক্রান্ত হিসাববিভাগে কাজ করিতেন এবং অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। সম্প্রতি ইনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। গোপালচন্দ্র মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রূপে এবং অন্যান্য সাধারণ কার্য্যে লোকহিতসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। বৈবাহিকের রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে হেমচন্দ্র একটি দীর্ঘ ব্যঙ্গরহস্যপূর্ণ কবিতা রচনা করেন, তাহাতে বৈবাহিকপত্নীর প্রতিও বেশ একটু রহস্য-প্রয়োগ ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্প্রতি কবিতাটি পাওয়া যাইতেছে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—◌*◌—

'আশাকানন', সিবিল সার্ভিস সভা, 'বঙ্গদর্শনে'র পুনরাবির্ভাব।

উমাকালী মুখোপাধ্যায়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের একখানি অভিনব কাব্যগ্রন্থ—'আশাকানন' —প্রকাশিত হয়। প্রকাশক তাঁহার পরম স্নেহভাজন সুহৃদ্ উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয়। কাব্যখানির পরিচয় প্রদানের পূর্ব্বে উহার প্রকাশকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কারণ হেমচন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং চিরানুগত সহচর ছিলেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ২৮শে সেপ্টেম্বর দিবসে মহাষ্টমী তিথিতে উমাকালী জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা, পিতামহ ও মাতামহের বাস ছিল গরলগাছায়। ইহাঁর পিতামহ গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গরলগাছার এক-জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। গোলোকচন্দ্রের যেমন অর্থ ছিল, তেমনই বংশমর্য্যাদা ছিল। ইনি কামদেব পণ্ডিতের সন্তান ও স্বকৃতভঙ্গের পুত্র ছিলেন।

উমাকালী প্রথমে তাঁহাদের বাড়ীর পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করেন। পরে বলুটী স্কুলে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এফ্-এ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন, সেই জন্য ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত পরীক্ষা দেন এবং গুণানুসারে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষাতেও তিনি উচ্চস্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি দুই বৎসর হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উক্ত বৎসরে ১৮ই মে দিবসে হাইকোর্টে উকীলশ্রেণিভুক্ত হন।

হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উমাকালী তাঁহার স্বগ্রামনিবাসী এবং হেমচন্দ্রের সহপাঠী ও বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে হেমচন্দ্রের নামে এক অনুরোধ পত্র লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্যামাচরণ বাবুর অনুরোধ ছিল যে হেমচন্দ্র যেন উমাকালীকে যতদূর সাধ্য সাহায্য করেন। বলা বাহুল্য উদার-হৃদয় হেমচন্দ্র উমাকালীর উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজের প্রতিভা ও শক্তি না থাকিলে অবশ্যই কেহ



উমাকালী মুখোপাধ্যায়

অসামান্য উন্নতিলাভ করিতে পারে না, এবং উমাকালীর নিজের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হেমচন্দ্র যে স্নেহ ও যত্নসহকারে তাঁহাকে উন্নতির প্রথম সোপানে আরোহণ করাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে স্নেহ ও সাহায্য না পাইলে উমাকালী এত শীঘ্র হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। উমাকালী হেমচন্দ্রের স্নেহের ঋণ কখনও বিস্মৃত হন নাই।

উমাকালীকে দুইবার হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত করিবার কথা উঠে, কিন্তু তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।

উমাকালী হেমচন্দ্র অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও হেমচন্দ্র তাঁহাকে সমবয়সী বন্ধুর ন্যায় দেখিতেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডব্লিউ, সি, বনার্জি, উমাকালী, হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রায়ই সম্মিলিত হইয়া সাহিত্যালোচনা করিতেন। উমাকালী হেমচন্দ্রের খিদিরপুরস্থ বাটীর অনতিদূরে বাস করিতেন এবং অধিকাংশ সময় তাঁহার সহবাসে থাকিতেন। তিনি জীবিত থাকিলে হেমচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত সঙ্কলন করা সম্ভব হইত। অতর্কিতভাবে মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া

লইয়া গিয়াছে। গত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারী দিবসে অকস্মাৎ হৃদ্রোগে উমাকালী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এবং কৃতান্তকুমার বসুর মৃত্যুসমাচার শ্রবণ করিয়া হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স্ বলিয়াছিলেন :—

"I have not had the privilege of knowing these two gentlemen in the same intimate way in which many of my brother Judges have, but I do know that Mr. Umakali Mookerjee was a man of remarkable personality—noted not only for his great learning and experience but also for his high character, honour and integrity. In fact I do not think that I can more rightly describe him than by applying those well-known words "*Justum et tenacem proposite virum.*" There is no doubt that this Court and the profession have sustained a very great loss through his death ; not only that, but many members of the Bench, in fact I might say all the members of the Bench, have suffered a severe personal loss, through his death, and they will always

hold his memory in affectionate regard as long as they live."

উমাকালীর বড় ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার জীবদ্দশায় হেমচন্দ্রের একটি জীবনচরিত লিখিত হয়। তিনি প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "হেমচন্দ্রের জীবনচরিত লিখিতে অগ্রসর হইয়া কেহ তাঁহার নিকট আসিল না!" আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, উমাকালী বাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপকরণাদি সংগ্রহ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন।

'আশাকানন'। 'আশাকানন' ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৩০শে মে দিবসে প্রকাশিত হয়। উহার প্রকাশকালে কলিকাতা গেজেটে, নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়।—

পুস্তকের নাম 'আশাকানন'—The Wilderness of Hope. বাঙ্গালা সাঙ্গরূপক কাব্য। গ্রন্থকার— হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৭ ভবানীচরণ দত্ত লেনে রায় প্রেসে বাবুরাম সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও উমাকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ৩০শে মে ১৮৭৬। পত্রসংখ্যা

১৭৫। প্রথম সংস্করণ ৬০০ ছাপা হইল। মূল্য একটাক।।
গ্রন্থকারের নাম ও ঠিকানা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।
মন্তব্য—"Intended to depict in plain colors the natural feelings and emotions of the human mind."

হেমচন্দ্র 'আশাকানন'কে একখানি সাঙ্গরূপক কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাঙ্গরূপক কাব্য কি, তাহা প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—

"আশাকানন একখানি সাঙ্গরূপক কাব্য। মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরাজি ভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগারি' কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহার সাদৃশ্যসূচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা ইহার অভিপ্রেত। ইহা বাহ্যতঃ সাদৃশ্যসূচক বিষয়ের বিবৃতি কিন্তু প্রকৃতার্থে গূঢ় বিষয়ের তাৎপর্য্যবোধক। এই ইংরাজি শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে এরূপ কোন শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত নাই। এবং কোন বিচক্ষণ পণ্ডিতের নিকট অবগত হইয়াছি যে সংস্কৃত ভাষাতেও অবিকল প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। তবে আলঙ্কারিকেরা যাহাকে অপ্রস্তুত প্রশংসা বলিয়া উল্লেখ করেন, যৌগিকার্থে তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু সাঙ্গরূপক শব্দ সম্যক অর্থবোধক হওয়াতে তাহাই ব্যবহার করা হইল।"

এই বিজ্ঞাপন পাঠে প্রতীত হয় যে হেমচন্দ্র এই কাব্যখানি প্রকাশের প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে উহা রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রকাশিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন —

"প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল এই কাব্য লিখিত হয়। কিন্তু কবি নানাকারণে সঙ্কুচিত হইয়া পুস্তকখানি প্রচার করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন. সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ইহা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এ প্রকার কাব্য সম্বন্ধে লোকের মতভেদ থাকিতে পারে ; এবং অনেক স্থলে কবিগণের আশঙ্কাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। হেমবাবুর সুললিত লেখনী বিনিঃসৃত কাব্য-রসাস্বাদনে সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া আমি ইহার মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সর্ব্বথা ঈদৃশ কাব্য বঙ্গসাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।"

তদানীন্তন বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, 'বৃত্রসংহার' রচয়িতার এ কি সঙ্কোচ! হেমচন্দ্রের চরিত্রের এই দিক আলোচনা করিলে বর্ত্তমান কালের অনেক লেখক শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

'আশাকাননে'র কল্পনা অতি সরল ও মধুর। কাব্যখানি দশটি 'কল্পনা' বা সর্গে বিভক্ত। সর্গারম্ভের পূর্ব্বে

বর্ণনীয় বিষয়টি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কাব্যখানিতে বর্ণিত বিষয় স্পষ্ট প্রতীত হইবে। যথা—

প্রথম কল্পনা। আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, তাঁহার সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ। বিভিন্ন দিক হইতে কর্ম্ম-ক্ষেত্রাভিমুখে প্রাণী সংপ্রবাহ।

দ্বিতীয় কল্পনা। কর্ম্মক্ষেত্র—ছয় দ্বার—ছয়জন প্রহরী কর্ত্তৃক রক্ষিত—পুরী পরিক্রম—প্রতি দ্বারে প্রহরীর আকৃতি ও প্রকৃতি দর্শন। ১ম দ্বারে শক্তি, ২য় দ্বারে অধ্যবসায়, ৩য় দ্বারে সাহস, ৪র্থ দ্বারে ধৈর্য্য, ৫ম দ্বারে শ্রম, ৬ষ্ঠ দ্বারে উৎসাহ—পুরী মধ্যে প্রবেশ—পুরীর মধ্যভাগে যশঃশৈল।

তৃতীয় কল্পনা। রত্নোদ্যান—আকাঙ্ক্ষাভবন—তন্নিবাসী-দিগের নৃশংস ব্যবহার ও কঠোর রীতি নীতি।

চতুর্থ কল্পনা। যশঃশৈল—নিম্নভাগে প্রাণিসমাগম—আরোহণ প্রথা—ভিন্ন ভিন্ন শিখর দর্শন—ভিন্ন ভিন্ন যশস্বী প্রাণি-মণ্ডলীর কীর্ত্তি-কলাপ দর্শন—বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ।

পঞ্চম কল্পনা। স্নেহ, ভক্তি, বাৎসল্য প্রণয় প্রভৃতির নিবাসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই অঞ্চল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়—কর্ম্মক্ষেত্র এবং স্নেহাদি অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তিনী নদী—তদুপরিস্থিত পরিণয়সেতু—তাহাতে প্রাণিগণের গতিবিধি।

ষষ্ঠ কল্পনা। প্রণয়োদ্যান, তাহাতে ভ্রমণ—অপূর্ব্ব তরু-পুষ্প দর্শন—সতী নির্ঝর—প্রণয়ের মূর্ত্তি—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ।

সপ্তম কল্পনা। স্নেহ-উপবন—মাতৃস্নেহ—সান্ত্বনামন্দির—দ্বারদেশে ভ্রান্তির সহিত সাক্ষাৎ।

অষ্টম কল্পনা। ব্রহ্মবন্দনা ও সরস্বতী-অর্চ্চনা।

নবম কল্পনা। বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ—আশার অন্তর্ধান—বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া কাননের প্রান্তভাগ দর্শন। শোকারণ্য—তাহাতে প্রবেশ ও ভ্রমণ—শোকের মূর্ত্তি দর্শন ও তাহার পরিচয়।

দশম কল্পনা। নৈরাশক্ষেত্র—মধ্যভাগে—মরুপ্রদেশ তাহাতে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণ্ড—হতাশের মূর্ত্তি দর্শন ও নিদ্রাভঙ্গ।

আশাকাননের কল্পনা যেরূপ সরল ও মধুর, উহার ভাষা ও ছন্দও সেইরূপ সরল ও মধুর। যে দামোদর নদের তীর হইতে কবি স্বপ্নের রাজ্যে গমন করিয়া আশা দেবীর সাক্ষাৎ পান, গ্রন্থারম্ভে সেই নদের তীরের কি সুন্দর বর্ণনা!—

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ ক্ষীরসম স্বাদু নীর,
বৃক্ষ নানাজাতি বিবিধ লতায় সুশোভিত উভতীর;
বিন্ধ্যগিরি শিরে জনমি যে নদ দেশ দেশান্তরে চলে;
সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত সুধৌত নির্ম্মল জলে,

পবিত্র করিলা যে নদের কূল সুকবি কঙ্কণ কবি
ফুটায়ে কবিতা কুসুম মধুর বাণীর প্রসাদ লভি,
যে নদ নিকটে রসবিহ্বলিত ভারত অমৃতভাষী
জনমি সুক্ষণে বাঁশীতে উন্মত্ত করেছে গউড়বাসী।
সেই দামোদর তীরে একদিন অরুণ উদয়ে উঠি,
দেখি শূন্যমার্গে ধরণী শরীরে কিরণ পড়িছে ফুটি।
দশদিশি ভাতি পড়িছে কিরণ আকাশ মেঘের গায়,
হরিদ্রা লোহিত বরণ বিবিধ গগনে চারু শোভায়।
গগন-ললাটে চূর্ণকায় মেঘ স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে,
কিরণ মাখিয়া পবনে উড়িয়া দিগন্তে বেড়ায় ছুটে।
পড়ে সূর্য্যরশ্মি দামোদর জলে আলো করি দুই কূল।
পড়ে তরু-শিরে তৃণলতা দলে রঞ্জিয়া প্রভাতী ফুল।

'আশাকাননে'র অনেক স্থলে এরূপ সুন্দর স্বভাব-বর্ণনা আছে যে পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহার বিস্তৃত পরিচয় দিলাম না। আমরা এই সুন্দর কাব্য হইতে কেবল মাত্র যশঃশৈলে ভারত সঙ্গীতের কবির সহিত আদি কবি বাল্মীকির সাক্ষাতের বিবরণ টুকু উদ্ধৃত করিব :—

ব্যাস, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি চরণ বন্দনা করি,
শঙ্কর আচার্য্য খনা লীলাবতী মূর্ত্তি হেরি চক্ষু ভরি,
উঠিনু সেখানে যেখানে বসিয়া বাল্মীকি অমর প্রায়
আনন্দে বাজায়ে সুমধুর বীণা শ্রীরাম চরিত গায়।

দেখিয়া আমারে অমর ব্রাহ্মণ দয়ার্দ্র মানস হয়ে,
দিল পদধূলি স্বদেশী জানিয়া আশু শিরস্ত্রাণ লয়ে,
জিজ্ঞাসিল ত্বরা অযোধ্যা-বারতা কেবা রাজ্য করে তায়,
ভারতীর পুত্র কেবা আর্য্যভূমে তাঁহার বীণা বাজায়,
কোন বীরভোগ্যা এবে আর্য্যভূমি, কোন্ ক্ষত্রী বলবান
দৈত্য রক্ষঃকুল করিয়া দমন রক্ষা করে আর্য্যমান,
কোন্ আর্য্যসুত- যশঃপ্রভাগুণে স্বদেশ উজ্জ্বলমুখ,
দ্বিতীয় জানকী হৈয়ে কোন নারী স্নিগ্ধ করে পতি-বুক,
কেবা রক্ষা করে বেদবিধি কর্ম্ম কোন বুধ মহামতি
ব্রাহ্মণকুলের তিলক স্বরূপ সাধন করে উন্নতি,
কত এইরূপ জিজ্ঞাসে বারতা সুধাইয়া বারম্বার,
কি দিব উত্তর ভাবিয়া না পাই চক্ষে বহে নীরধার।
হেরি অশ্রুধারা করুণ বাক্যেতে ঋষি অতি ব্যগ্রমন
আগ্রহে আবার অতি সযতনে কৈলা মোরে সম্ভাষণ।
কহিনু তখন কি বলিব ঋষি কি দিব সম্বাদ তার—
তোমার অযোধ্যা তোমার কোশল সে আর্য্য নাহিক আর
ডুবেছে এখন কলঙ্ক-সলিলে নিবিড় তমসা তায়,
সে ধনু-নির্ঘোষ সে বীণা-ঝঙ্কার আর না কেহ শুনায়,
নিস্তেজ হয়েছে দ্বিজ ক্ষত্রীকুল বেদ ধর্ম্ম সব গিয়া,
ভাসে পুণ্যভূমি অকূল পাথারে পরমুখ নিরখিয়া।

কিন্তু হেমচন্দ্র কেবল স্বজাতির অবনতিতে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই—তিনি উদ্দীপনার কাব

—তিনি আশার কবি। আশা-মুকুরে তিনি ভারতের ভবিষ্যতের যে চিত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাও তিনি তাঁহার অমর তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন—

দেখিলাম চাহি যেন পূর্ব্বদিক জ্বলিছে কিরণময়,
ভারত-মণ্ডল সে কিরণে যেন প্রদীপ্ত হইয়া রয়।
ভারত-জননী যেন পুনর্ব্বার বসিয়াছে সিংহাসনে,
ফুটিয়াছে যেন তেমনি আবার পূর্ব্ব তেজ হাস্যাননে,
ঘেরিয়া তাঁহারে নব আর্য্যজাতি কিরীট কুণ্ডল তুলি
পরাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্জ্বল ঝাড়িয়া কলঙ্ক-ধূলি
নবীন পতাকা তুলিয়া গগনে ছুটেছে আবার দূত
ভুবন ভিতরে করি ঘন নাদ বদনে প্রভা অদ্ভুত,
দিক দশ বাসী মানব মণ্ডলী আনি সপ্ত সিন্ধুজল
করে অভিষেক বলে উচ্চনাদে জাগ্রত আর্য্যমণ্ডল,
পশ্চিমে উত্তরে হয় ঘোর ধ্বনি আনন্দ-সঙ্গীত গায়,
উঠে সিন্ধুবারি ভারত প্রক্ষালি আবার গর্জ্জিয়া ধায়,
উঠে হিমালয় পুনঃ শূন্য ভেদি পূর্ব্বের বিক্রম ধরি,
ছুটে পুনরায় জাহ্নবী যমুনা গভীর সলিলে ভরি ;
আনন্দে আবার ভারত সন্তান বীণা ধরে করতলে
আবার আনন্দে বাজায়ে দুন্দুভি বসুন্ধরা মাঝে চলে।

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাব্য সম্বন্ধে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আশাকাননও একখানি অতি

সুন্দর কাব্য। তবে তাহাতে সৌন্দর্য্য ভিন্ন অন্য কোনও বিশেষ গুণ বর্ণনা করিবার নাই।" কেবল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করাই কি কম প্রশংসার কথা! বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, "সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্যপ্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকলপ্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক। * * * যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।"

আধুনিক পাঠকগণের নিকট 'আশা-কানন' কিরূপ আদর পাইবে বলিতে পারি না। শীত রজনীতে কুহেলিকা ও ধূমে সমাচ্ছন্ন কলিকাতার রাজপথে বিচরণ করিতে করিতে যখন আমাদের শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হয় তখন আমরা শরতের সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর কথা ভাবি এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি। আজি কালিকার দুর্ব্বোধ্য রূপক কাব্যগুলি পাঠ করিবার সময়েও মধ্যে মধ্যে আমাদের মনে 'আশা-কাননের' ন্যায় রূপক-কাব্যের সরল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার বাসনা উদিত হয়।

'আশা-কানন' আদ্যোপান্ত ত্রিপদীচ্ছন্দে রচিত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন "বাঙ্গালা ছন্দের জ্ঞান—

ত্রিপদী ও পয়ার। * * হেমবাবুও, পয়ার ও ত্রিপদী যে বাঙ্গালা পদ্যের জান, তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। ছন্দে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাহারও অপেক্ষা ঊন নহেন। * * যে যে স্থলে, তিনি প্রসাদগুণ রাখিতে পারিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তিনি বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।" সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র শোচনীয় অনুদারতার সহিত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "হেম-বাবুর কবিতা অনেকস্থলেই প্রসাদগুণের অভাবে সফল হইতে পারে নাই।" কিন্তু পাঠক-সাধারণ অধিকাংশ স্থলেই হেমচন্দ্রের কবিতার প্রসাদগুণে মোহিত হইয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক হেমচন্দ্র সরল ও মধুর ত্রিপদী রচনায় সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। তাঁহার অনায়াস ত্রিপদীরচনা তথা পরিহাসরসিকতা সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ গল্প আমরা হাইকোর্টের জুনিয়ার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী ও ৺উমাকালী বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহা এস্থলে বিবৃত করিলে পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না।

• "ত্রিপদী রচনা খুব সহজ।" পূজার



শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

অবকাশে হেমচন্দ্র প্রায়ই দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। একবার বন্ধু উমাকালীর সহিত চুণারে বেড়াইতে যান। সেখানে ত্রিপদীচ্ছন্দে কতকগুলি কবিতা রচনা করেন। একদিন উমাকালী বাবু হেমচন্দ্রকে রহস্য করিয়া বলিলেন, "আপনি কি সেকেলে ত্রিপদী লেখেন, ত্রিপদী রচনা খুব সহজ ;—ও ত' সকলেই লিখিতে পারে।" হেমচন্দ্র বলিলেন, "বেশ্ ত! তুমি ত্রিপদী লেখ না।" উমাকালী বলিলেন, "আপনি কি মনে করিতেছেন আমি পারিব না? আমি নিশ্চয়ই লিখিব।" এই বলিয়া উমাকালী তৎক্ষণাৎ পেন্সিল কাগজ লইয়া ত্রিপদী রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হেমচন্দ্র উমাকালী বাবুর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে! কতদূর লিখিলে?" উমাকালী মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন, "গোড়ার দুইটা পদ লিখিয়াছি, খানিক্‌টা আপনি ধরাইয়া দিলে বেশ লিখিতে পারিব।" হেমচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা, কি লিখেছ পড় দেখি।" উমাকালীবাবু পড়িলেন,—

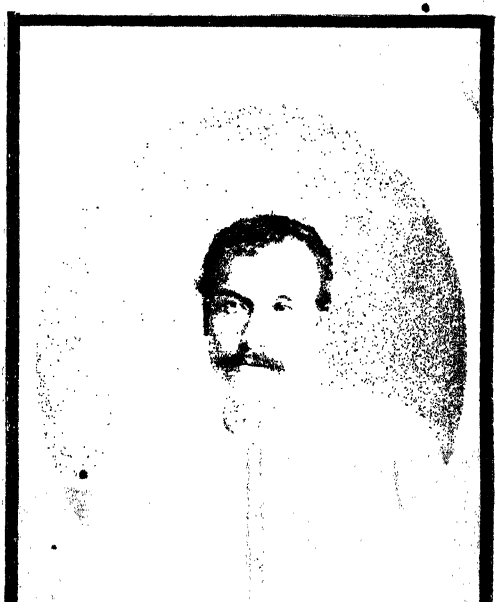
চুণার নগর, পর্ব্বত উপর'—

হেমচন্দ্র বলিলেন, "বাঃ, বেশ আরম্ভ হ'য়েছে। এর

পর আর কি লিখ্‌বে ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌ছ না ? ত্রিপদী রচনা খুব সহজ হে,—লিখে যাও না—

চূণার নগর, পর্ব্বত উপর,
ললনা-বর্জ্জিত দেশ।
ললনা-বিরহে, যার প্রাণ দহে,
তাহার দফাটি শেষ॥"

'বিজ্ঞান-সমাজ।' এই বৎসর (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Indian Association for the Cultivation of Scienceএর প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের এই জাতীয় শিক্ষা-মন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের সমস্ত উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। এই সদনুষ্ঠানে স্বদেশ-প্রেমিক হেমচন্দ্রেরও যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল, এবং পুরাতন সংবাদপত্রাদি দৃষ্টে প্রতীত হয় যে এই অনুষ্ঠানের সহায়তাকল্পে তিনি আড়াইশত টাকা দান করিয়াছিলেন। দেশহিতকর সকল অনুষ্ঠানের প্রতিই স্বজাতি-বৎসল হেমচন্দ্রের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তাহার একটি দৃষ্টান্ত পরে প্রদত্ত হইতেছে।



ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই (যৌবনে)

'ভারত সভা'। একসময়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ আমাদিগের দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক সভা ছিল। অভিজাত-সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষিত হইলেও রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি জননায়কগণ উহাকে সাধারণের হিতার্থে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই সভা হইতেই প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া হরিশ্চন্দ্র নীলকর-দিগের বিরুদ্ধে সেই মহান্ ধর্ম্মযুদ্ধের সূচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের তিরোধানের পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ সভার অবনতি হয়। বেতনভোগী সম্পাদক ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় জমীদারগণের কল্যাণের জন্য উহাকে নিয়োজিত করেন। যেখানে প্রজার স্বার্থ ও জমিদারের স্বার্থে সংঘর্ষ ঘটিত, সেখানে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন ও তাহার মুখ-পত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' জমিদারপক্ষই সমর্থন করিতেন। সাধারণের জন্য একটি রাজনীতিক সভার আবশ্যকতা এই সময়ে বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়। পূজনীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবনে আনন্দ-



আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী

মোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সম্মিলনের স্থান ছিল। সেখানে রাজনীতি বিষয়ে ইহাঁদের সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা হইত। সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে বঙ্গদেশে মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের জন্য রাজনীতির শিক্ষা ও আন্দোলনের উপযোগী কোনও সভা নাই। কথাবার্ত্তা হইতে হইতে অবশেষে একটি রাজনীতিক সভা স্থাপনের সংকল্প সকলের হৃদয়ে জাগিল। সেই সঙ্কল্পের ফলস্বরূপ ১৮৭৬ সালে 'ভারতসভা' স্থাপিত হইল। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে সে একটা স্মরণীয় দিন।"

আচার্য্য শিবনাথ তদীয় আত্মচরিতে ভারতসভা-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আরও বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন। তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধারযোগ্য—

"আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি, তিনজনে আর এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে আসার পর হইতেই আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনও রাজ-নৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম্ম নয় অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্য বিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমরা তিনজনে কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশ



আনন্দমোহন বসু

হিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য। অমৃত-বাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কেও লওয়া হইল। মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে এই পরামর্শ চলিল। তাহার সকল পরামর্শে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কার্য্যান্তরে অন্যত্র ছিলাম। কি পরামর্শ হইতেছে তাহা আনন্দমোহন বাবু ও সুরেন্দ্রবাবুর মুখে শুনিতাম। যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন বাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন, এতদ্বারা দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। কে কে এই উদ্‌যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাসা করাতে আমরা যখন অপরা-পর ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমৃতবাজারের দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, "যা! তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে কেন?"

আনন্দমোহন বাবু ও আমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরি-লাম যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি ত জানাই আছে, তাঁহার কাছে স্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। যাকে ভাল জানিবেন তাকে স্বর্গ দিবেন, যাকে মন্দ জানিবেন তাকে



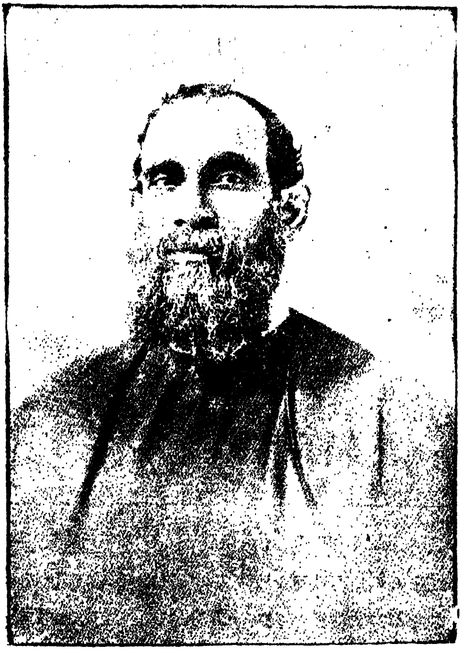
মনোমোহন ঘোষ (যৌবনে)

নরকে দিবেন। শিশির বাবুদের প্রতি বোধ হয় কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন আর ওদের নামও সহিতে পারেন না।

কি আশ্চর্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানব প্রকৃতির অভিজ্ঞতা! কি আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্দর্শনের শক্তি! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। একটা সভা স্থাপন করা স্থির হইলেই, আনন্দ-মোহন বাবুর মুখে শুনিলাম, শিশির বাবুর দল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন:"এই সভায় সম্পাদক হবেন কে?" মনোমোহন বাবু, সুরেন্দ্রবাবু, আনন্দমোহন বাবু সে বিষয়ে মনোযোগ দেন না। তাঁহারা বলেন সে পরে স্থির হবে, যাঁকে সকলে মনোনীত করিবেন, তিনিই হবেন। 'ভারত-সভা' স্থাপনের বিজ্ঞাপন বাহির হইল! সে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার ২।১ দিন পরে সংবাদ পত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে মধ্যবিত্তদিগের জন্য একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিবার জন্য এক সভা হইবে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি ও শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া ঐ সভা স্থাপিত হইতেছে। আমরা একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া গেলাম! কারণ শিশির আদি হইতে আমাদের পরামর্শের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু আমরা ভারত সভা স্থাপনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম না। ইণ্ডিয়ান লীগ অগ্রে হইল কি ভারত-সভা অগ্রে স্থাপিত হইল, মনে নাই।* এই মাত্র মনে আছে, এলবার্ট হলে

---

* ইণ্ডিয়ান লীগই অগ্রে স্থাপিত হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে



শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশ্য সভা করিয়া ভারত-সভা স্থাপন করা গেল, এবং আনন্দ মোহন বাবুকে তাহার সম্পাদক করা গেল। আর সেদিনকার কথা এই মনে আছে যে সেদিন সুরেন বাবুর একটী পুত্রসন্তান মারা যায়, তিনি তৎসত্ত্বেও আসিয়া সভাস্থাপনে সহায়তা করিলেন। আনন্দমোহন বাবু সম্পাদক, সুরেন বাবু সহ-সম্পাদক, আমরা কয়েকজন কমিটির সভ্য, আমি প্রথম চাঁদা আদায়কারী সভ্য, এই লইয়া ভারত-সভা বসিল। আমরা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীটে একটি ঘর ভাড়া করিয়া ভারত-সভার আপিস স্থাপন করিলাম। সে আপিস ঘরের অবস্থা দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ সুরসিক কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত ভারত-উদ্ধার কাব্যে লিখিয়াছেন "কড়ি আগে পড়ে কিম্বা দড়ি আগে ছেঁড়ে।" বাস্তবিক উহার দশা ঐ প্রকারই ছিল।

অকৃত্রিম স্বদেশসেবক আনন্দমোহন ও মনোমোহনকে শিশিরকুমার তাঁহার লীগেরও অন্যতম অধ্যক্ষ নিযুক্ত

২৬শে জুলাই 'ব্যবস্থা-দর্পণ' প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকারের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়, তাহাতে ভারত-সভা স্থাপিত হয়। এক উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি আর একটি সভা Indian League স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-সভা স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পরে সুরেন্দ্রনাথ উহার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলে সভা স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

করিয়াছিলেন। কিন্তু (আচার্য্য শিবনাথের আত্মচরিতে বর্ণিত) কোনও কারণবশতঃ আনন্দমোহন ও মনোমোহন লীগের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমও দলাদলির সঙ্কীর্ণতার অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত ছিল। তিনি ইণ্ডিয়ান্ লীগ ও ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন উভয় সমাজের কার্য্যেই আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তিনি লীগের সভ্য হইলেও ভারত সভার কার্য্যে কিরূপ সহযোগিতা করিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত পরে প্রদত্ত হইতেছে।

'সিভিল সার্ভিস সভা'। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড সল্‌স্‌বেরী এক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন যে, ১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদিগকে পরীক্ষা দিতে হইবে। এই নিয়মে এ দেশের শিক্ষিত যুবকগণের পক্ষে সিবিল সার্ভিসে প্রবেশের দ্বার একপ্রকার রুদ্ধ করা হইল। ১৯ বৎসরে পরীক্ষা দিতে হইলে ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে যাওয়া আবশ্যক। কোন্ বালককে তাহার জনক জননী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সেই অপরিণত বয়সে বিদেশে নানা প্রলোভনের মধ্যে পাঠাইবেন? এই বয়সে একটি দুরূহ বিদেশীয় ভাষাই

আয়ত্ত হয় না, সুতরাং পরীক্ষায় তাহাদের সাফল্যও অনিশ্চিত। বিদেশীয় যুবকগণই বা কতটুকু অভিজ্ঞতা লইয়া এদেশে শাসন কার্য্য সম্পাদন করিতে আসিবেন? তাহাতে কি দেশের শাসন কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদিত হইবে?—এইরূপ নানা আপত্তি চারিদিকে উত্থাপিত হইল। ভারত সভার প্রথম কার্য্য হইল এ বিষয়ে বিধিসঙ্গত আন্দোলন করা। এতদুদ্দেশ্যে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ দিবসে ভারত সভার সম্পাদক আনন্দমোহন কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় প্রায় তিন সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজা স্যর নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুপস্থিতিতে মনোমোহন ঘোষ প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন যে, মহারাণীর ঘোষণা অনুসারে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণকে উচ্চপদ লাভ করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় যুবকগণের ন্যায় সুবিধা ও সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। বাগ্মীপ্রবর কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া একটি হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা করেন। পরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন যে, পরীক্ষার্থীদের বয়স



কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (যৌবনে)

উনিশ বৎসরের অনধিক হইবে এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ ইহাতে মুখস্থ বিদ্যার আদর করা হইল, শাসন-বিভাগে ভাল লোক আসিবে না, এবং এতদ্দেশীয়গণের পক্ষে সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করা একেবারে অসম্ভব হইল। হেমচন্দ্র এই প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে অনুরুদ্ধ হন। হেমচন্দ্র এ সকল বিষয়ে বাঙ্গালার তদানীন্তন দেশনায়কগণের সহিত আলোচনা করিতেন বটে, কিন্তু কখনও প্রকাশ্যসভায় বক্তৃতাদি করিতেন না। বন্ধুগণের অনুরোধে তিনি ডাক্তার সরকারের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য বক্তৃতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

Gentlemen,—It would be presumptuous on my part, after the eloquent addresses you have heard, to attempt to make a speech. I should have been well content by simply seconding the Resolution which has been so ably moved. The importance of the subject, however, is such that I should not be justified in commending it to your consideration

without saying a few words. Gentlemen, I but repeat an oft-told tale when I say that the Indian Civil Service is unique in the history of the world. As a body, its capabilities have been great, its duties and responsibilities immense, and its achievements, in some respects wonderful. Indeed, it is difficult to decide who won the Indian Empire for England—the Civilian or the Soldier. But great as have been its achievements, greater have yet to be accomplished. With the growth of time India has grown into a vast Empire. Its manifold needs are daily increasing ; and the functions which the servants of the Government are called upon to perform are daily becoming more difficult and complicated. The people of the country have begun to understand their interests, to watch the actions of their Governors, and to criticise their measures. Under these circumstances, it would appear that in recruiting for the civil service of India, authorities in England should take steps

to secure the best available men—men of solid culture, varied accomplishments, and above all, mature judgment. It has been truly said that the acquirements and accomplishments of the Indian Civil Servant should be encyclopaedic. We need only to consider the functions which the Indian Civilian is called upon to perform from almost his first entrance into the service, to understand how very essential, how very indispensable, these qualifications are. Almost from the beginning, he has to become a ruler of men. Under the present regime, the Magistrate Collector is the chief executive of the District. He is now a very different personage from what he was before : he is now almost the omnipotent functionary in whose hands are placed the destinies of thousands of people —people not of his own nationality and religion, people not able to assert and maintain their rights, but people who are the conquered subjects of an alien power. Now, is it possible to expect the culture,

the cool discretion, the mature judgment indispensably necessary in such an officer, in a youth of nineteen, for that, under the present rules, is the age at which the candidate will be selected? Is it possible, I ask in the name of common sense, to expect from him that wide acquaintance with men and manners—that knowledge of the world, which to be a good governor of men he must possess, when at twenty-one he enters upon his active duties? It is strange that in a country, whose laws prescribe the period of minority to extend to 21 years, there should be statesmen who consider it prudent and wise to place men who are just emerging out of nonage to rule over thousands of foreign subjects—men who in their own country would scarcely be considered old enough to take care of themselves and to transact their own affairs. But unfortunately India is the land of experiments—experiments of all sorts of vague and wild theories, and the mighty wisdom of

British statesmanship has ruled that the experiment of governing India by mere school-boys should be tried. I know that the covenanted civilians have to serve their apprenticeship for a few short years, as a Joint or an Assistant Magistrate. But during those years they improve but little, and the selected civilian is virtually placed in the position of ruler of millions from almost his first entrance into the service.

Gentlemen, it is not given to us to know accurately the reasons which influence our Governors here and the authorities in England in proposing and passing measures which affect the interests of the inhabitants of India. We have, therefore to make surmises of our own, and if in making them we fall into error, the fault lies not with us; it lies with those who refuse to take us into their confidence. In the present instance, we may therefore, not be altogether to blame if we surmise that the object of these rules was, perhaps, to exclude the Indian candidates

from the covenanted service. If this be the object—if the motive be to damp, to quench the aspirations of our young countrymen, our rulers will find that they are mistaken. So long as England holds the torch of Western Civilization in India, the hopes and aspirations, which have been raised, will burn in the bosoms of Indian youths. In spite of all obstacles, there will be forthcoming a few daring aspirants ready to brave the dangers of the sea and the risks of a journey through Europe to force their way into the Civil Service.

But gentelmen, by the operation of these rules the bulk of Indian candidates will be practically excluded. I ask then, is this justice, is this fair play, is this worthy of the great English nation in whose hands Providence has been pleased to place our destiny ? One observation more and I have done. It has been more than once said that one of the reasons which induce the Government to hesitate in encouraging the Indian candidates, is

that the people of the different parts of the country regard each other with distrust—with feelings of jealousy. It is said, for instance, that the people of the N. W. Provinces, or those of the Punjab look down upon the people of Bengal—look down upon them with contempt and with a feeling somewhat akin to hatred. I know not how far this assertion is founded upon fact. I hope and I believe, it is not so ; and the best proof that it is not well grounded—the best refutation of the charge has this day been furnished to you by the mass of correspondence which you have heard read from different parts of India. With that correspondence before you, can you say that the assertion is correct, or that the charge has a real foundation ? If, however, such prejudices exist in certain quarters (if they do exist at all), it is because the Bengalis have been too loyal to the British rule, because it is thought that by means of the Bengalis the British power has been

firmly established in India. Let but the light of education and Western culture spread, let it reach those dark corners of prejudice and ignorance, and these jealous feelings will melt and vanish away as melts the snow under the rays of the sun. And, gentlemen, it is my hope, my belief, nay, my firm conviction, that then United India will throb with one heart.

এই সভায় আনন্দমোহন বসু, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, যদুনাথ ঘোষ প্রভৃতিও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যে সভায় মনোমোহন, কালীচরণ, আনন্দমোহন,, মহেন্দ্রলাল প্রভৃতি বক্তারা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই সভায় হেমচন্দ্রের বক্তৃতা উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছিল—ইহা হেমচন্দ্রের সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। এই সভার কার্য্যবিবরণ-সমালোচন প্রসঙ্গে ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় হিন্দু পেট্রিয়টে লিখিয়াছিলেন যে কালীচরণ ও যদুনাথের বক্তৃতার ভাষা কিছু তীব্র হইয়াছিল, কিন্তু "Babu Hem Chandra Banerjee, who we are glad to see is coming forward on occasions like this, was temperate and sensible."

এই আন্দোলন অধিকতর বিস্তৃত করিবার জন্য বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে বক্তৃতা করেন এবং লালমোহন ঘোষ মহাশয়কে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। ইংলণ্ডে লালমোহন ভারতবর্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন ইংরাজ ও ভারতবাসীকে সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেট মার্কুইস অব হারটিংটনের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে একটি আবেদন পত্র প্রদান করেন। এই আন্দোলন একবারে নিষ্ফল হয় নাই। ইহার কিছু-দিন পরে এদেশের কতিপয় যুবককে ষ্ট্যাচুটারি সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদত্ত হয়।

হেমচন্দ্রের এক প্রদৌহিত্র বলেন যে, তিনি হেম-চন্দ্রের এই বক্তৃতা সম্বন্ধে স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের নিকট একটি কৌতুকাবহ গল্প শুনিয়াছিলেন। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতে হেমচন্দ্র অভ্যস্ত ছিলেন না। বক্তৃতা করিতে করিতে উকীল হেমচন্দ্র একবার সমবেত ভদ্রগণকে "Gentlemen" বলিয়া সম্বোধন না করিয়া, "My Lord" বলিয়া সম্বোধন করিয়া-ছিলেন। ইহাতে সভায় উচ্চ হাস্যরোল উত্থিত হইয়া-ছিল।

"বঙ্গদর্শনের পুনরাবির্ভাব।" চারি বৎসর অপূর্ব্ব যোগ্যতার সহিত 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের বিলোপসাধন করিলে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার কার্লাইল কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় বঙ্গদর্শনের কার্য্য সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"বঙ্গদর্শন এই চারি বৎসরকাল বঙ্গভাষার পূজারূপ পবিত্র উৎসবে অকাতর প্রাণে পরিশ্রম করিয়াছে, আর, যদি আমরা নিতান্ত অন্ধ না হই, বঙ্গভাষার বৈভব বিস্তারেও বহুল অংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। মধুসূদন যেমন দেবী বঙ্গভারতীকে মিত্রাক্ষর ছন্দের নিগড় হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শনও ভাষাকে কতকগুলি কুসংস্কারের নিগড় হইতে নির্ম্মোচন করিবার জন্য সেইরূপ অশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, এবং বস্তুতঃ তদর্থে বীরের মত অশেষ অত্যাচারও সহিয়াছে। এই হেতুই আমরা উহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে চিরবদ্ধ, এবং এই হেতুতেই আজি উহার তিরোধানে আমরা এইরূপ দুঃখে দুঃখিত। বঙ্গদর্শনে আমরা বাঙ্গালার চল সৌন্দর্য্য, লীলাচাতুর্য্য, আবেগ, উচ্ছ্বাস ও সজীবতা দেখিয়াছি। ইহা কেমনে শীঘ্র বিস্মৃত হইব? উহা আমাদের কর্ণে কখনও নিশীথে বংশীধ্বনির ন্যায় মধুধারা ঢালিয়া দিয়াছে, কখনও বীণার মৃদুল ঝঙ্কারে হৃদয় মন উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা কিরূপে ভুলিতে পারিব?

"আমরা আশা করি, বঙ্গদর্শন শীঘ্রই অন্য কোন মূর্ত্তিতে

পুনর্জ্জীবিত হইবে, এবং যিনি উহার প্রাণ ও প্রতিপত্তি ছিলেন, আর যাঁহাদিগের পরিশ্রমে উহার এত গৌরব বাড়িয়াছিল তাঁহারা সকলে মিলিয়া পুনরায় বঙ্গভাষার অধিকার ও বৈভব-বিস্তারে যত্নপর হইবেন। বাঙ্গালায় আজিও সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আজিও শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালির সহিত বাঙ্গালার দৃঢ় সম্বন্ধ বিশ্বাস জন্মে নাই, আজি পর্য্যন্তও বাঙ্গালার অভাব ও প্রভাবের সীমা রেখা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, যে পর্য্যন্ত না এ সমস্ত গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা বঙ্গদর্শনের মত প্রতিভান্বিত সহায়কে বিদায় দিতে সমর্থ হইব না। আমরা সকল সহিতে পারি, সর্ব্বপ্রকার নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা অক্ষুব্ধ হৃদয়ে ভোগ করিতে পারি, ; কিন্তু জননী জন্মভূমি এবং জন্মভাষার কাতর মূর্ত্তি ও দশা চক্ষে দেখিতে পারি না। পৃথিবীতে কোন্ ভূমি বঙ্গভূমির ন্যায় শ্যামল শোভাশালিনী, স্বজনপরিপালিনী ও নদ নদীর স্বাভাবিক সম্পদে উদারতার প্রতিমূর্ত্তি রূপিণী? কিন্তু বাঙ্গালীর অনাদরে উহার কি অবস্থা ঘটিয়াছে! পৃথিবীতে কোন্ ভাষা বঙ্গভাষার ন্যায় হৃদয়স্পর্শিনী, অমৃতবর্ষিণী এবং আমাদিগের সন্তাপহারিণী? কিন্তু—আত্মাদরশূন্য প্রাণহীন বাঙ্গালীর উপেক্ষা ও অবমাননায়, যাঁহারা ধন বৈভব সম্পন্ন তাঁহাদিগের মোহ মহিমায়, যাঁহারা বিষয়রত, গণনাতৎপর, তাঁহাদিগের মদান্ধতায় এবং যাঁহারা শিক্ষিত ও শক্তি-সামর্থ্য যুক্ত তাঁহাদিগের নির্লজ্জ উদাসীনতায় উহার মুখশ্রী কিরূপ মলিন রহিয়াছে।"

উপরিধৃত অংশে কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালাভাষার উন্নতিকামী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অভিপ্রায়ের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। ফলে, বিলোপসাধনের একবৎসর পরে (বৈশাখ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ) বঙ্গদর্শন পুনরুজ্জীবিত করিতে হইল। বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রচারকালে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্য্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা পুনর্জ্জীবিত হইল।"

এবার কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন না। তিনি লিখিলেন, "যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে ততদিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।"—বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন।

বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রচারসম্বন্ধে কবিবর নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' লিখিয়াছেন—

"বঙ্গদর্শন অল্পদিন পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবু, অক্ষয়বাবুর ভাষায়, গলা টিপিয়া মারিয়াছিলেন। উহা পুনঃ প্রচারিত করিবার চেষ্টা করা আমার এইবার বিদায় লওয়ার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। কারণ বঙ্গদর্শনের অদর্শনের সহিত বঙ্গসাহিত্যে এবং আমাদের হৃদয়ে যেন একটা নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। অতএব চুঁচুড়ায় অক্ষয় বাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে আমি বঙ্গদর্শনের পুনঃ প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন "বটে, 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করাটা তোমাদের বড়ই প্রাণে লাগিয়াছে। লাগারই কথা। কিন্তু কি করিব, আমি একে ত দাসত্বভারে পীড়িত, তাহার উপর স্বাস্থ্যের এবং পরিশ্রম শক্তিরও সীমা আছে। ইদানীং 'বঙ্গদর্শনে'র প্রায় তিনভাগ লেখার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। কাযেই আমি আর পারিলাম না। তাহা ছাড়া, নিরপেক্ষ সমালোচনায় একটা দেশ আমার শত্রু হইয়া উঠিতেছিল। শুনিয়াছি কোনও কোনও গ্রন্থকার আমাকে মারিতে পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়াছিল। গালাগালির ত কথাই নাই। স্যর জর্জ্জ কেম্বেলের পর বোধ হয়, আমি এ বাঙ্গালার গালাগালির প্রধান পাত্র, (I am the worst abused man in Bengal, next only to Sir

George Campbell). তোমরা বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচার করিতে চাহ, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি আর সম্পাদক হইব না।" আমরা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম, অনেক অনুনয় করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিলেন না। কিন্তু অক্ষয় কি সঞ্জীব বাবুকে সম্পাদক প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত দিনটা তর্কে বিতর্কে ও পরামর্শে কাটিয়া গেল। অক্ষয় বাবু বলিলেন, তিনি বৈতনিক সম্পাদক মাত্র হইতে পারেন, কার্য্যাধ্যক্ষ তিনি হইবেন না। সঞ্জীব বাবু কার্য্যাধ্যক্ষ হইতে স্বীকার করিলেন। তখন অক্ষয় বাবু মাসিক দুইশত টাকা বেতন চাহিলেন। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, এত বেতন চলিবে না ; কারণ বঙ্গদর্শনে দুইশত টাকার অধিক আয় কখন হয় নাই। তখন স্থির হইল যে সঞ্জীব বাবু উভয় সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ হইবেন এবং এভাবে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রচারিত হইবে।"

কবিবর নবীনচন্দ্র এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের এক অজ্ঞাত পরিচ্ছেদের উপর অনেকটা আলোকপাত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 'দাসত্ব ভারে পীড়িত ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্রশক্তি' বঙ্কিম, সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ' ও দেবীচৌধুরাণী' লিখিয়াছিলেন, সুতরাং প্রধানতঃ বঙ্গদর্শনে সমালোচিত গ্রন্থগুলির প্রণেতৃগণ কর্তৃক প্রহৃত হইবার ভয়েই

যে তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার ত্যাগ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ নবীনচন্দ্রের অনুগ্রহ ব্যতীত বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন ঐতিহাসিক জানিতে পারিতেন না। বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রচার যে প্রধানতঃ নবীনচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের জন্যই হইয়াছে, ইহাও অকৃতজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও স্বীকার করেন নাই, এবং নবীনচন্দ্র স্বয়ং না বলিলে আমরা কেহই জানিতে পারিতাম না।

সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রচনাদি।

১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন সম্পাদন করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

পূর্ব্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ন রহিল। যাঁহারা পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। অনেক নূতন লেখক—যাঁহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও লিখিতে লাগিলেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দ মঠ', 'দেবী' তাঁহার সম্পাদকতাকালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্যগ্রহণ করিয়া, 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'পালামৌ,' 'বৈজিকতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে'

লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগ, এবং কার্য্যাধ্যক্ষের কার্য্যের বিশৃঙ্খলতায় বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাকি পড়িতে লাগিল।"

সঞ্জীবচন্দ্র, অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির ন্যায়, নিয়মিতভাবে কাজ করিতে ভালবাসিতেন না। হেমচন্দ্রের প্রকৃতি ইহার ঠিক বিপরীত ছিল। সকল কাজ তিনি নিয়মিত ভাবে করিতে ভালবাসিতেন। বোধ হয় বঙ্গদর্শনের অনিয়মিত প্রকাশের জন্যই সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্রের কবিতাদি বেশী প্রকাশিত হয় নাই। অথবা পারিবারিক অশান্তিও ইহার কারণ হইতে পারে। কেবল নিম্নলিখিত কবিতাগুলি সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি :—

(১) "ভুলোনা ও কুহুস্বর ভুলোনা আমায়।" বঙ্গদর্শন ৫ম খণ্ড, আষাঢ় ১২৮৪।

(২) একটি প্রিয় জলাশয়। বঙ্গদর্শন ৯ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯।

(৩) হায় কি হলো ? বঙ্গদর্শন ১০ম খণ্ড ১২৯০ সাল, ১০৩ সংখ্যা (কার্ত্তিক)

(৪) নববর্ষ। ১২৯০ সাল, ১০৬ সংখ্যা (মাঘ)

আমরা পূর্ব্বপ্রথানুসারে এই কবিতা কয়টি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব।

(১) ভুলোনা ও কুহুস্বর,—ভুলোনা আমায়।

—হিমঋতুর অবসানে পিক আকুল প্রাণে ললিত উচ্ছ্বাসে ডাকিয়া উঠিল,—'হৃদয়ের বেগ তার হৃদি তটে রয় না'। কবির দুঃখ, 'হায় বঙ্গ-হৃদি কেন অইরূপে বয় না'। বঙ্গবাসীর কোনও বিষয়ে উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, বাঙ্গালী হাসে, কাঁদে, কিন্তু তাহাতে গভীরতা নাই, আবেগ নাই, মাদকতা নাই—

মাদকতা নাহি তায়! বসুধায় না ঢলায়।
হৃদয় পাথার তায় উথলিত হয় না।
দেবখাতে বিনা গ্রীষ্মে স্নিগ্ধ নীর বয়না!

অসার নিঃস্রোত এই বঙ্গের হৃদয়!
হাসিতে কাঁদিতে প্রাণে, গভীরতা নাহি জানে
না জানে উৎসাহ বানে প্রাণের প্রলয়।
জগৎ ভাসানো বেগ বঙ্গেতে কোথায়?

তিনি বাঙ্গালার কবিগণকে তাই অনুরোধ করিতেছেন—

বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারও হৃদয়ে,
গাও হে তবে সে গীত, শুনায়ে কর জীবিত,
নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও।
রহস্য, রোদন কিম্বা উৎসাহে ভাসাও।

এসো ভ্রাতঃ কবিকুলে আছ কোন জন।
শুন হে গভীর স্বর কি ঝরিছে মনোহর
কোকিলের কুহুরবে! অমনি কীর্ত্তন
না শিখিবে যত দিন ছেড়োনা বাদন।

কবি বঙ্গের কামিনীকুলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

হে কামিনীকুল মৃত বঙ্গের পীযূষ!
কর পণ শিখাবারে পতি পুত্র তনয়ারে
সফল করিতে এই কবির স্বপন
রেখো মনে দ্রৌপদীর বেণী বাঁধা পণ।

কিন্তু কবি হেমচন্দ্র ভিন্ন আর কোন্ কবি 'বঙ্গের অন্তর ভেদি উচ্ছ্বাস তুলিয়া' এরূপ 'উন্মত্ত করিয়া গানে কুহক' দেখাইয়াছেন, 'প্রভাতের জ্যোতিঃ বঙ্গ-নিশিতে' মিশাইয়াছেন?

এই কবিতাটি বঙ্গদর্শনের পাঠিকাগণের প্রতিনিধি স্বরূপিণী বঙ্কিম-সহধর্ম্মিণীকে উৎসৃষ্ট—

হে বঙ্গদর্শন-প্রিয় ভামিনী যতেক !
কারে সম্বোধিব আর   লইতে এ উপহার ?
বাঁকা চাঁদ আঁকা যার হৃদয়-রাকায়
সমর্পি তাহারই করে, স্মরিয়া সবায়।
ভুলোনা ও কুহুস্বর—ভুলোনা আমায়।

একটি প্রিয় জলাশয়। এই কবিতাটিতে হেমচন্দ্রের ভবনের সম্মুখস্থিত প্রিয় পদ্মপুকুরকে কবি চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। এই কবিতাটি কবিবরের গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইতে দেখি নাই, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে উহা সমগ্র উদ্ধৃতও করিতে পারিলাম না। শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

ন' বৎসর হতে,   বসন্ত শরতে
হেমন্ত বরিষা ভাগে।
হে বিশাল হ্রদ   সরল বিশদ
অই রূপ হৃদে জাগে॥
গুটায়েছে বেলা   জীবনের ভেলা
এবে ধিকি ধিকি যায়।
তবু তোর তীর   প্রাসাদ কুটীর
ভুলিতে নারিরে হায়॥
চারিধারে ঘাট   রজকের পাট
অই তরু সারি জল—

দেখিলে এখনও　　　　নিশিতে কখনও
ভেজেরে হৃদয় তল ॥
মনে পড়ে কত　　　　হারায়েছি যত
এখন খুঁজিলে নাই।
আমি যাব চলে　　　　লোকে যেন বলে
তোর তীরে ছিল ঠাঁই ॥

৩। **হায় কি হলো।** ইহাতে কবি বর্ষ-সমালোচনা করিতে গিয়া 'খানিক রসের কথা' ছড়াইয়া দিয়াছেন। ইহাতে ইল্‌বার্ট বিলের সেই মহা আন্দোলনের অশ্বডিম্ব প্রসবের কথা, কিরূপে 'কথার দোষে সুরেন গেল জেলে' এবং তাঁহার জেল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কালে কিরূপে 'গুলি পুরে গোরা ফউজ দাঁড়িয়ে বারাকপুরে' তাহার চিত্র, ন্যাশনেল্ ফনের ঢলাঢলির কথা, 'হেষ্টি পিগট মিষ্টি কথা—মিষ্টিরি তলায়!'—জুবার্টের একজিবিসনের কুফল প্রভৃতি সরস ভাষায় বর্ণনা করিয়া হেমচন্দ্র হাসির তুফান তুলিয়াছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রের সংবাদ দিতেও তিনি ভুলেন নাই—

হায় কি হলো বঙ্গদর্শন বঙ্কিম দেছে ছেড়ে।
হায় কি হলো দেশটা গেছে সাপ্তাহিকে জুড়ে।
হায় কি হলো ভুদেব গেলো ছেড়ে গুরুগিরি।
হায় কি হলো হেম নবীনের নাইকো জারিজুরি।

৪। নববর্ষ। 'টেনিসনের অনুকরণে' রচিত। পৃথিবীর নূতন যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি অমর ভাষায় বিশ্ব-প্রেমের যে মহামন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেশের নূতন যুগের মহাকবি আমাদের মাতৃভাষায় সেই মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

হৃদয় মন্দিরে অসত্য নিবারি
শিখহ পূজিতে সতে।
* *
* * ধনাঢ্য নির্ধন
কলহ করহ দূর,
ধরণীর শেল দৌরাত্ম্য আধার
ভাঙ্গিয়ে করহ চূর।
* * *
সহস্র বৎসর শান্তির সলিলে
শীতল হউক ধরা।
* * *
পৃথিবী আঁধার ঘুচায়ে আবার
জ্বলুক তরুণ ভাতি,
নরকুল তায় সুধর্ম্ম প্রভায়
পোহাক বিঘোর রাতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

'বৃত্রসংহার'—দ্বিতীয় খণ্ড

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'বৃত্র-সংহার দ্বিতীয় খণ্ড' প্রকাশিত হয়। উহার প্রকাশকালে কলিকাতা গেজেটে নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়।

"পুস্তকের নাম 'বৃত্রসংহার' বা the slaughter of Britra বাঙ্গালাভাষায় লিখিত। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য ১৭ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন রায় প্রেসে মুদ্রিত এবং ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৭। পত্রসংখ্যা ২২৬ রয়েল ডুয়োডেসিমো। প্রথম সংস্করণ ৫৫০ খণ্ড মুদ্রিত হইল। মূল্য ১৲ এক টাকা। গ্রন্থ-সত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—খিদির পুর। মন্তব্য—Verses on the demon Britra who was killed by Indra, whom he had previously expelled from heaven".

পাঠগকণ! কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা কাব্যসাহিত্যের যে অপূর্ব্ব তাজমহলের কিয়দংশ সন্দর্শন করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইয়া ছিলাম, এক্ষণে আসুন আমরা সেই বিচিত্র সৌধের অবশিষ্ট অংশ পরিদর্শন করিয়া পূর্ণানন্দ লাভ করি। সেবারে প্রসিদ্ধ সাহিত্যশিল্পী ও

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের প্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন। এবারে তদীয় মধ্যমাগ্রজ প্রতিভাবান সঞ্জীব চন্দ্র আমাদের প্রধান পথপ্রদর্শক হইবেন। ১২৮৪ সালের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের 'বঙ্গদর্শনে' সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র বৃত্রসংহার দ্বিতীয় খণ্ডের যে সুবিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন * তাহাই আমাদিগের প্রধান সহায়স্বরূপ হইবে। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের যে অসাধারণ উপাসক ছাগশিশুতে মানব সন্তানের রূপরাশি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন, যিনি পালামৌর

* সঞ্জীবচন্দ্রের সমালোচনা সম্বন্ধে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবনে' লিখিয়াছেন :--"শুনিয়াছিলাম হেমবাবুর বিশেষ অনুরোধেও বঙ্কিমবাবু 'বৃত্রসংহারের দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা করেন নাই। সঞ্জীব বাবুই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' উহার এক অতিরিক্ত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন। উহাতে 'বৃত্রসংহারে'র সাহিত্যিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্ব্বশেষ বঙ্গদর্শনের ঘটকালিতে দর্শন বিজ্ঞানের বৈবাহিক কত প্রশংসাই ছিল। কিন্তু তাহাতেও সমালোকের তৃপ্তি ছিল না। সর্ব্বশেষ লিখিলেন 'বৃত্রসংহার' একশ্রেণীর কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' আর একশ্রেণীর কাব্য। তবে বৃত্রসংহার 'পলাশীর যুদ্ধ' অপেক্ষা ভাল!"



সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাইজীতে গেঙ্গোখালির মোহানার পাখীর রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যিনি কোল কামিনীগণের দেহে 'কোলাহল' দেখিয়াছিলেন, যাঁহার রামেশ্বর শান্ত সমুদ্রের মৃদুগর্জ্জনে তাহার আনন্দ দুলালের আহ্বান-ধ্বনি শুনিতে পাইত, যিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি" আসুন পাঠকগণ, আজি আমরা সরল, উদার ও বিশ্বপ্রেমিক পিতম পাগলের সেই সরল ও উদার সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত একবার বালকের ন্যায় কৌতূহল লইয়া এই বিচিত্র প্রাসাদের নূতন কক্ষগুলি পরিভ্রমণ করিয়া প্রীতিরসে প্রবৃত্ত হই।

হায় হতভাগ্য হেমচন্দ্র! তুমি বিশেষ অনুরোধ করিয়াও বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে আর একটি সুপারিষপত্র জোগাড় করিতে পারিলে না! কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এবারে সার্টিফিকেটটি দিলেন না কেন? অক্ষয়চন্দ্রের বিদ্রূপের ভয়ে, না কোন পরশ্রীকাতর নবীন কবি কর্ত্তৃক প্রহৃত হইবার ভয়ে? যিনি সুদূরপ্রসারিণী কল্পনার বলে হেমচন্দ্রকে বিশেষ অনুরোধ করিতে দেখিয়াছিলেন তিনি আজি লোকান্তরে, সুতরাং কে আমাদের এ প্রশ্নের সদুত্তর দিবেন?

বৃত্রসংহার দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ হইতে চতুর্ব্বিংশ সর্গ, এই ১৩টি সর্গে বিভক্ত।

দ্বাদশ সর্গ। একাদশ সর্গের শেষে ঐন্দ্রিলা-কৃত শচীর অপমানে শিবের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। দ্বাদশ সর্গের প্রারম্ভে সেই ক্রোধাগ্নিশিখা সন্দর্শন করিয়া বৃত্রাসুর স্তম্ভিত, ভীত।

> "শূল হস্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে,
> দাঁড়ায়ে ভূধর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া,
> একদৃষ্টে শূন্যদেশে কটাক্ষ হানিছে
> যেখানে শিবের ক্রোধচিহ্ন দেখা দিল।"

বৃত্র অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে করিতে মহিষীর নিকট গেলেন। ইচ্ছা শচীকে মুক্ত করিয়া শিবকে প্রসন্ন করেন। মহিষীকে শিবের ক্রোধাগ্নিশিখা দেখাইলেন

> "চেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্নির রেখা
> এখন(ও) ভাতিছে মৃদু সুমেরু-উপরে—
> দীপ্ত অন্ধকার যথা!"

কিন্তু ঐন্দ্রিলা, সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষায়, 'লেডি ম্যাকবেথের মত স্বামীর আশঙ্কা মুখঝামটায় উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, "ও কোন গ্রহে গ্রহে কি নক্ষত্রে

সংঘর্ষণ হইয়া অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে, অথবা দেবতার মায়া!

“আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আসনে
হতেম দেখিতে তবে আমার কি পণ!
ভয় চিন্তা দ্বিধা দয়া আমার হৃদয়ে
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে।”

বৃত্র বলিলেন, “তুমি স্ত্রীলোক।” ইহাতে ঐন্দ্রিলা গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

‘বামা আমি’ দনুজেন্দ্র রমণী কি হেয়?
তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা?
পুরুষের বন্ধু বামা—মন্ত্রী পুরুষের
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।

শুন ওহে দৈত্যনাথ, ‘বামা’ সত্য আমি,
ঐন্দ্রিলা ত্রিলোকখ্যাত গন্ধর্ব্ব দুহিতা;
সামান্য অবলা নহে দানবী ঐন্দ্রিলা;
ঐন্দ্রিলা তোমার ভার্য্যা, শুন, হে দানব।

সত্যই যদ্যপি শচী-হরণে ত্র্যম্বক
ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে,
সত্যই যদ্যপি হয় সে উচ্চ নিনাদ
প্রলয়-বিষাণ-শব্দ—স্তব্ধ কেন তায়?

খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা ;
ক্রুদ্ধ যদি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্ব্বাণ
হবে না জানিহ পুনঃ—ভাবনা কি তবে ?
ভাবনা কার্য্যের আগে সাধন এখন ।

কিন্তু বৃত্র ঐন্দ্রিলার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া রতিকে শচী আনয়নে আদেশ দিলেন, অভিপ্রায় তাঁহাকে কারামুক্ত করিবেন। তদনন্তর বৃত্র প্রাচীর শিরে উঠিয়া দেবশিবির দেখিতে লাগিলেন। দেবশিবিরের সেই মণিময় বর্ণনা সঞ্জীবচন্দ্র সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বাহুল্যভয়ে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না।

ত্রয়োদশ সর্গ। মহেশের আদেশানুসারে ইন্দ্র পৃথিবীতলে অবতরণ করিয়া বজ্র সৃষ্টির জন্য দধীচির অস্থি-সংগ্রহ-মানসে অরণ্যের মধ্য দিয়া তদীয় আশ্রম অভিমুখে যাইতেছেন। দৈত্যভয়ে স্বর্গচ্যুতা দেবকন্যা-গণ পশুপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া এই অরণ্যে দিন যাপন করেন, রজনী সমাগমে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই অটবী মধ্যে কেলিরঙ্গ করিতেছিলেন! সঞ্জীব-চন্দ্র বলেন 'অল্প কথায় এই চিত্রটি বর্ণিত হইয়াছে,

কিন্তু যে পড়িবে সে সহজে ভুলিবে না।' দেবকন্যাগণ স্বর্গোদ্ধার সম্বন্ধে ইন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে, ইন্দ্র তাঁহার আগমনের হেতু বলিলেন। তাঁহার ভীতি ও বিষাদ অপনোদন করিয়া দেবকন্যাগণ দধীচির চরিত্র বর্ণনা করিয়া বলিলেন—

'জীব উপকারে ঋষি জগতে অতুল।
ব্রত পর উপকার স্বার্থ পরিহার;
কল্পনা, কামনা, চিন্তা পরের মঙ্গল,
কিবা কীটে কি পতঙ্গে সদা দয়াশীল
মুনীন্দ্র কৃপার সিন্ধু—জীবচূড়ামণি।

এবং দেবেন্দ্রকে দধীচির অশ্রমপথ দেখাইয়া দিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র বলেন, "লোকহিতৈষী পরহিতব্রত শান্তি-রস-নিমগ্ন মহর্ষির আশ্রমাদির বর্ণনা বড় মনোহর।" আশ্রমে প্রবেশ করিলে ঋষি ইন্দ্রকে বন্দনা করিয়া তাঁহার আশ্রমে আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু ইন্দ্র ঋষির প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন, তিনি কিরূপে সে নিষ্ঠুর বাণী মুখে আনিবেন? তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'তাহার পর যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসদৃশ করুণা ও বীররসপরিপূর্ণ লোমহর্ষণ চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ।

এই সরল সুধাময় কথাগুলি বিস্তৃত হইলেও উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।" সঞ্জীবচন্দ্রের পদানুসরণ করিয়া আমরাও স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য আত্মোৎসর্গের সেই পবিত্র ও মহান চিত্রখানি এইস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া এই প্রস্তাবের পত্রগুলি পবিত্র করিব—

"হেরি ঋষি, ক্ষণকালে ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ ; গদ গদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
পুরন্দর শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,

জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম !
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হয়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি !
হা দেব এ ভাগ্য মম স্বপ্নের(ও) অতীত !

এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন,—
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন মাঝে, কৈলা অধিষ্ঠান

সুনিবিড় সুশীতল, পল্লব শোভিত,
শত বাহু, বটমূলে। আনি যোগাইলা,

সাশ্রুনেত্রে শিষ্যবৃন্দ, আকুল হৃদয়,
যোগাসন, গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।

জ্বালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুরু; গুগ্‌গুল,
সর্জ্জরস ; সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।

তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি, জ্যোতিঃ সুবিমল
নির্ম্মল নয়ন দ্বয়ে গণ্ড ওষ্ঠাধরে !
সুললাটে আভা নিরুপম ! বিলম্বিত
চারু শ্মশ্রু, পুণ্ডরীক-মাল্য বক্ষঃস্থলে !

বসিলা ধীমান্‌—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে।
চাহি শিষ্যকুল মুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন, অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,

সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;—কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলী, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত ? এ ভবমণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কতজন ?

* * *

ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিলা এত বলি
আশীষিলা শিষ্যগণে, কহিলা বাসবে---
'হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি. দেহ মম বারেক পরশি।"

অগ্রসরি শচীপতি সহস্রলোচন
তপোধন শিরঃস্পর্শ সুকর কমলে,
কহিলা আকুলস্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—

'সাধু শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক।
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন!
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর।

* * *

বলিয়া রোমাঞ্চ তনু হইলা বাসব
নিরখি মুনীন্দ্র মুখে শোভা নিরমল!

আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ গান,
উচ্চ হরিসংকীর্ত্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ, ধ্যানে মগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।

মুনি শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি স্নিগ্ধ নভস্থল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বন লতা তরুকুল শোকে অবনত!

দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিঃশ্বাস-শূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ---ক্ষণে শূন্যে উঠি

মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য---হরিশঙ্খ, শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি।---
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

সঞ্জীবচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন "সুশীতল সুস্থির সাগরবৎ এই কাব্যাংশ মনকে মোহিত করে—ইহার অতল রসপ্রবাহে মন ডুবিয়া যায়।"

চতুর্দ্দশ সর্গ। স্বর্গে ইন্দ্রাণী বন্দিনী।

"—শোভিছে তেমতি
চিরপরিচিত যত অমর বিভব।
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে
অমরা হাসিছে আজি।"

বহুদিন পরে প্রবাস হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, কাহার মনে সুখের উদয় না হয়? কিন্তু সেই স্বদেশকে পুনরায় শত্রু-পদদলিত দেখিলে কাহার মনে অসীম দুঃখের উদয় হয় না? অমরায় ফিরিয়াও সেই জন্য শচীর মনে আনন্দ নাই।

কে আছে ত্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া,
(কি পঙ্কিল, কিবা মরু কিবা গিরিময়
সে জনম-ভূমি তার) নিরখি পূর্ব্বের

পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু সরোবর,
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্ব্বত, প্রাণীকুল,
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হয়ে
'এই জন্মভূমি মম!' কে আছে রে, হায়,

ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শত্রু পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ!
বিজেতা চরণতলে নিত্য বিদলিত
বলিতে আপন যাহা—প্রিয় এ জগতে!

বিজন অরণ্যভূমি---বনের(ও) কুসুম
ভুঞ্জিতে পরাণে ভয়! শত্রুর অর্চ্চনা

দেব অর্চ্চনার আগে, ত্রিসন্ধ্যা যেখানে!
কেনো ভোগে নরকের যন্ত্রণা সে দেশে?

চিত্তময়ী ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে
সে পীড়া দহন আজি।

চপলা ইন্দ্রাণীকে অমরার সুখের দিনগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন।

আহা, প্রবাসের পরে, কিবা মনোহর
স্মৃতিরশ্মি চিন্তাপথে খেলে মৃদুতর,
অস্তসূর্য্যরেখা যথা কাদম্বিনী-কোলে
খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজলি গগন!"

কিন্তু পতিপুত্রবিরহিতা শচীর নিকট আজ—

"স্বর্গ নহে চপলা, এ—ইন্দ্রাণীর কারা!'

* * *

"কি আহ্লাদ,
আহা সখি. ভুঞ্জিনু সেদিন মর্ত্ত্যধামে
পুত্রকোলে বসিনু যখন সে নৈমিষে!

কোথা স্বর্গ তার কাছে, হায় লো চপলে!
ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিলাম তা হতে অধিক
সুখ এ অমরালয়ে! পুত্র পেলে কোলে
জননীর স্বর্গসুখ---সর্ব্বত্র সমান।

শচী রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বৃত্র-প্রেরিতা রতি আসিয়া জানাইলেন যে দৈত্যপতি তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য ডাকিয়াছেন। সঞ্জীবচন্দ্র বলেন, "শচী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পঞ্চম সর্গে যখন নিঃসহায়ে অরণ্যে সম্মুখীন ভীষণাসুর দেখিয়া চপলা তাঁহাকে ছদ্মবেশ ধরিতে বলিয়াছিল, শচী তখন বলিয়াছিলেন—

"আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন।
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব এখন।"

এখনও সেই শচী।" শচী দৈত্যেন্দ্রের করুণার দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন—

"মোচন করিতে আমা, নাহি কি সে কেহ,
অকুল অমরকুল থাকিতে এখানে?
না রতি, কহগে দৈত্যে —চাহিনা উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা,

পতি হস্তে যতদিন মুক্তি নহে মম!"
এত কহি স্থির নেত্রে শূন্যদেশে চাহি
উচ্ছ্বাসিলা চিত্ত বেগ "হে শিবে শৈলজে,
জীব দুঃখ বিনাশিনি, শচী নিজালয়ে

সেবিবে ঐন্দ্রিলা-পদ দেখিবে তা তুমি ?"
নীরবিলা বাসব-বাসনা সুরেশ্বরী।
স্থলপদ্ম তুল্য, মরি, উৎফুল্ল-বদনে
শোভা দিল অপরূপ। প্রভাতিল যেন

তাড়িত কিরণ স্থির তুষার রাশিতে
আভাময়,---আভাময় করি দশদিক !
শিহরিলা অনঙ্গমোহিনী হেরি শোভা ;
ভাবি মনে অসুরের ক্রোধন মুরতি,
কাঁদিয়া চলিলা ধীরে ঐন্দ্রিলা আগারে !

পঞ্চদশ সর্গ। এই সর্গে দেবাসুর যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে :—

ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল
খেলে রঙ্গে বেলাসঙ্গে সাগরের কুলে---
কভু জলরাশি দম্ভে ছুটে উঠে তীরে
আবার পালটি ধায় সিন্ধুর গর্ভেতে
তেমতি সমর রঙ্গ অমর-দানবে।

এই যুদ্ধে দেবগণ দানবগণকে প্রায় পরাজিত করিয়াছিল। অবশেষে কুমার জয়ন্তের ভীষণ আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ করিতে না পারিয়া রুদ্রপীড় বাধ্য হইয়া—

"ভঙ্গ দিলা
সেনা সঙ্গে, সর্ব্ব অঙ্গে শোণিতের ধারা।"

দৈত্য-পরাভব দেখিয়া বৃত্র শিবদত্ত ত্রিশূল-পরিত্যাগ করিলেন। অব্যর্থ ত্রিশূলের ভয়ে দেবগণ লুক্কায়িত হইলেন—ত্রিশূল লক্ষ্য না পাইয়া বৃত্রের হস্তেই ফিরিয়া আসিল।

দেখিলা দনুজপতি সে অস্ত্র আলোকে
রণস্থল ভীম শবস্থল এবে! একা
সে প্রাঙ্গণ মাঝে! যথা নগরাজ চূড়া
মৈনাক, মীনেন্দ্র তিমি বেষ্টিত সাগরে।
গজ কূর্ম্ম রণে যবে উড়ে বৈনতেয়।
দেখিলা অদূরে হায়, ধূলি বিলুণ্ঠিত
দনুজ বিজয় কেতু! নেহারি দুঃখেতে
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাকা,
ধীরগতি আলয়ে ফিরিলা চিন্তাকুল।

এই সর্গের যুদ্ধ বর্ণনায় স্থানে স্থানে মহাভারতের ছায়া পড়িলেও সঞ্জীবচন্দ্র বলেন উহার মধ্যে মধ্যে কবিত্বকুসুমও আছে। যথা যেখানে বৃত্র—

মথিতে লাগিলা বেগে দেব-চমূরাশি
উড়িল অমর তনু আচ্ছাদি অম্বর
যথা সে কার্পাসরাশি উড়ায় ধুনারি।
টঙ্কারি ধুনন যন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে

অথবা যেখানে

ধাইছে মার্ত্তণ্ড
উজলি সমর সিন্ধু---উজলি যেমন
বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শত ক্রোশ।"

ষোড়শ সর্গ। সঞ্জীবচন্দ্র বলেন, "যেমন পঞ্চদশ সর্গে বৃত্রের রণজয়, ষোড়শ সর্গে তেমনি ঐন্দ্রিলার রণজয়। বৃত্রের রণজয় শিবের ত্রিশূলে—ঐন্দ্রিলার রণজয় মন্মথের ফুলধনু লইয়া। রসিক কবি বৃত্রের রণজয় অপেক্ষা ঐন্দ্রিলার রণজয় গাঁথিয়াছেন ভাল। আমরা তাঁহার এই পক্ষপাতিতা দেখিয়া নিন্দা করিয়াছি।

শিবের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া বৃত্র শচীকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐন্দ্রিলার ইচ্ছা শচী তাঁহার সেবাকারিণী পরিচারিকা হন।

ঐন্দ্রিলার আদেশে মদন স্বর্গে এক অপূর্ব্ব শোভা-সমন্বিত নিকুঞ্জ নির্ম্মিত করিলেন, যথায়—

নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর
নিনাদ মধুর থর থর থর
মঞ্জরী দোলে।"

যথায়—

ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখিকুল,—
স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল ,
কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল
উড়ি ডালে ডালে ; কুরঙ্গ ব্যাকুল
বেড়ায় ছুটে ॥"

ঐন্দ্রিলা এই নিকুঞ্জে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় রতি আসিয়া শচীর দর্পিত উত্তর শুনাইল। দৈত্যেন্দ্রাণী বলিলেন—তিনি স্বয়ং শচীকে আনিতে যাইবেন এবং রতিকে বলিলেন—

"সাজা দেখি রতি ভাল করে মোরে,
* * *
সাজা এইখানে যত অলঙ্কার,
যত বেশভূষা আছেলো আমার,

রতন-মুকুট, মণিময় হার,
জয়লব্ধ ধন—ধনেশ-ভাণ্ডার
ঢাল যুবতি।
আন যান পুষ্পরথ, অশ্ব, গজ,
নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বজ,
আন বীণা, বেণু, মন্দিরা, মুরজ,
আমার যা কিছু ;---মানস-পঙ্কজ
ফুটাব আজ॥"

রতি তাঁহাকে অপূর্ব্ব সাজে সাজাইল। এমন সময় বৃত্র রণজয় করিয়া আসিলেন। কুঞ্জের শোভা ও ঐন্দ্রিলার সাজ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। ঐন্দ্রিলার বৈভব সকল কুঞ্জের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঐন্দ্রিলা বলিলেন—

কোথা তবে আর রাখিব এ সব,
কহ শুনি ওহে হৃদয়-বল্লভ !
কার গৃহ, হায়, ভবন ও সব
দেখিছ ওখানে ? অমর বিভব !
শচী-ভবন !
অমরার রাণী !—ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী
কহিলা রতিরে, কহিলা বাখানি,
এ ভুবন তার !– কহিলা কি জানি

তস্কর আমরা ?—চাহেনা সে ধনি
কারা-মোচন।

শুনিয়া বৃত্র ক্রুদ্ধ হইলেন—

আমার আদেশ হেলিলি ইন্দ্রাণি ?
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী,
বলি ছিঁড়ি কেশ দুই হস্তে টানি
ছুটিল হুঙ্কারি,—হেরি দৈত্যরাণী
বামা চতুর
নিল ফুল ধনু আপনার হাতে,
বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তা'তে)
আকর্ণ পূরিয়া ; বসি হাঁটু গাড়ি
(সাবাস সুন্দরী !) বাণ দিল ছাড়ি
ঈষৎ হাসি।
অব্যর্থ সন্ধান ! মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ পরাণ
ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব-কামিনী
লাবণ্য রাশি !

ঐন্দ্রিলার রণজয় সম্পূর্ণ হইল :—

কহে দৈত্যপতি "তোমায় সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্রসহচরী,

যে বাসনা তব, তার দর্প হরি
পুরাও মহিষি ;—ফণাচূর্ণ করি
আন ফণিণী ।”

তখন ঐন্দ্রিলা “হরষে উন্মত্ত” হইয়া “গজেন্দ্রগমনে” শচীর দর্প চূর্ণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

সপ্তদশ সর্গ। রুদ্রপীড় অগ্নি এবং জয়ন্তের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন, সেই দুঃখে তাঁহার শরীর দহিতেছিল। তিনি পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রার জন্য পিতার আজ্ঞা লইলেন। যথার্থ বীরের ন্যায় বৃত্র অনুমতি দিলেন—

“যাও রণে অরিন্দম, পুত্র রণজয়ী
পাল বীরধর্ম্ম ভাগ্যে যা থাকে আমার।”

পরে রুদ্রপীড় জননীর অনুমতি লইতে গেলেন। রুদ্রপীড়কে বিদায় দিতে জননী ঐন্দ্রিলার(ও) “শিলাময় হৃদয় তিতিল।” জননীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া রুদ্রপীড় পত্নী ইন্দুবালার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। কোমলহৃদয়া ইন্দুবালার প্রাণে সহে না যে কেহ যুদ্ধ করে।

* * বুঝিতে নারি কিরূপে এ সব
অসুর অমরকুলে মহাবীর যত
(নিদয় নহে লো তারা) আপনা পাশরি
জীবন ঘাতক অস্ত্র হানে পরস্পরে,
না ভাবে মমতা লেশ, নাহি ভাবে দয়া,
সদাই উন্মত্ত প্রায় নিঠুর সমরে,
হানি অস্ত্র বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে
কত যে যাতনা জীবে জীবন নিধনে।

ইন্দুবালা কিছুতেই স্বামীকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন না, রুদ্রপীড়ও যাইবেন। ইন্দুবালা বলিলেন—

"যাবে নাথ? যাবে কি হে ছিঁড়িয়া এ লতা?
বেঁধেছি তোমায় যাহে এত সাধ করি!
ছিঁড়ে কি হে তরুবর ঘেরে যদি তায়,
তরুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া?
ছিঁড়িলে তবুও নাথ লতিকা ছাড়ে না।
গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ?
কোথা নাথ বল বল তরঙ্গের গতি
বিনা সে সাগরগর্ভ?

রুদ্রপীড় তাহাতেও শুনিলেন না। তখন—

কহিলা সরলাবালা নয়নের জলে,
ভিজিল বীরের বর্ম্ম হৈম সারসন

"যাবে যদি নাশো আগে এই লতাকুল
পালিনু যে সবে দোঁহে যত্নে এতদিন।
এই পুষ্প তরুরাজি কিসলয়ে ঢাকা
দেখ দেখ কত পুষ্প দুলি ডালে ডালে
অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা
স্বহস্তে অর্জ্জিনু যায় কতই আদরে।
নাশো আগে এই সব বিহঙ্গম রাজি
রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে নয়নরঞ্জন,
প্রতিদিন পালিলা যে সব দুগ্ধদানে,
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে যায় হইতে কাতর!
নাশো এই সখিগণে, আজীবন যারা
সুখের সঙ্গিনী মম আজীবন কাল
সম্প্রীতে পালিলা সদা—সেবিলা প্রাণেশ
প্রাণ মন দেহ স্নেহ রসে মিশাইয়া।
নাশো পরে এ দাসীরে—জীবন নাশিতে
নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি নাথ—
পাতিয়া দিলাম বক্ষঃ, হান এ হৃদয়ে
সে রক্তপিপাসু অসি রণে যাও বীর।"
বলি মূর্চ্ছাগত ইন্দুবালা ইন্দুমুখী
সখীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন
রুদ্রপীড় স্নেহে চুম্বি অধর ললাট
শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চল গতিতে।

নীরবে চাহিয়া পথ থাকি কতক্ষণ
কহিলা দানব কন্যা চারু ইন্দুবালা—
"হায় সখি সংগ্রামের মাদকতা হেন !
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ !"

অনন্তর ইন্দুবালা পতির মঙ্গলের জন্য শিবপূজা করিতে গেলেন—

সুবিল্ব, চন্দন, পুষ্পমাল্য, সুবসন
অর্পি শিবমূর্ত্তি পরে স্থির ভক্তি সহ
ধ্যানে শিবমূর্ত্তি ভাবি, জপি শিবনাম,
বর মাগিবার আগে উঠিলা সুন্দরী
উঠিলা সবিল্ব জল ঢালিতে মস্তকে ;
ধরিলা মঙ্গল ঘট ভক্তির উল্লাসে ;—
হায় রে বিমুখ যারে বিধাতা যখন,
কোন সে কামনা সিদ্ধ নাহি হয় তার !
সহসা কাঁপিল হস্ত দানব-বালার,
কাঞ্চন মঙ্গল ঘট পড়িল খসিয়া
মহাদেব মুর্ত্তি'পরে—খণ্ড খণ্ড হয়ে,
বিল্বপত্র জল পুষ্প ছুটিল চৌদিকে।
অধীর হইলা দেখি ইন্দুবালা সতী ;
দর দর দুনয়নে ঝরিল সলিল ;
শিহরিল শীর্ণ তনু ; 'হে শম্ভু' বলিয়া
ভূতলে পড়িলা বালা স্বামী মুখ স্মরি।

পতির অমঙ্গলাশঙ্কায় ম্রিয়মাণা ইন্দুবালাকে রতি স্মরণ করাইয়া দিলেন—

প্রিয়জন অকুশল অশুভ চিন্তায়

এবং সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন—

নাহি কি ভাবিতে অন্য ? হৃদয় বেদনা
জুড়াতে নাহি কি আর উপায়, সরলে ?
সমদুঃখী পরাণীর যাতনা সকলি
ভুলিলে কি চারুমতি ? ভুলিলে শচীরে ?

শচীর দুঃখের কথা স্মরণ হওয়ায় কোমল-হৃদয়া ইন্দুবালা আপনার দুঃখ ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইলেন। রতি ইন্দুবালাকে শচীর নিকট লইয়া গেলেন।

অষ্টাদশ সর্গ। সঞ্জীবচন্দ্র বলেন,"অষ্টাদশ সর্গ প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্য। বিষয়ও গীতিকাব্যের—কাব্য ও গীতি। এরূপ ওজস্বিনী তূর্য্যধ্বনি-সদৃশ গীতি হেমবাবু ভিন্ন আর কেহ লিখিতে পারে না। মন্দাকিনী তীরে—

কুলু কুলু ধ্বনি চলে মন্দাকিনী, দেবকুল-প্রিয় পবিত্র তটিনী
লতায়ে লুটিছে সুর মনোহর, মন্দার দুকুলে দুকুল সুন্দর
সুরভি বিমল ফুল শোভায়।

যে ফুলের দলে সুরবালাগণে, হেলাইত তনু বিহ্বলিত মনে
না হেলিত ফুল সুর-তনু ধরি, খেলিত যখন অমর অমরী
শীত পুষ্পরেণু মাখিয়া গায় ॥
যখন অমরা ছিল অমরের, সুরধামে দম্ভ না ছিল দৈত্যের,
সুরবালা কণ্ঠে সঙ্গীত ঝরিত, সে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত,
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে।
যখন পৌলোমী আখণ্ডল বামে, বসিত আনন্দে চিরানন্দ ধামে
দেবঋষিগণ আনি পুণ্ডরীক, অমৃত হৃদের---বাক্যে অমায়িক
দিত শচীকরে গরিমাগুণে।
সেই মন্দাকিনী তীরে ম্রিয়মানা, মন্দির অলিন্দে শচী সুলোচনা,
কাছে সুহাসিনী চপলা সুন্দরী, রতি চারুনেত্রা বসি শোভা করি
যেরেছে মাধুর্য্যে অমরা রাণী।

এই সর্গে রতি ইন্দুবালাকে শচীর নিকট লইয়া গিয়াছেন। শচী তাঁহাকে নানা কথায় ভুলাইতেছেন, এমন সময় অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিতা ঐন্দ্রিলা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন—

নিকটে আসিয়া, চিত্ত চমকিত, নেহারে ঐন্দ্রিলা হইয়া স্তম্ভিত,
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী বদন, চারুদীপ্তিময় অতুল কিরণ
সুচিত্রে যেমন স্বপনে লিখা।
কোথারে ঐন্দ্রিলা তোর বেশভূষা? অভূষিত তনু জিনি চারু উষা
ভাতিছে আপনি প্রকাশিয়া বিভা, তনু-শোভাকর মনের প্রতিভা
উছলি হৃদয় জ্বলিছে মুখে।

হায়রে মলিন শশাঙ্ক যেমন, হেরি দিনমণি দানবী তখন
মলিন তেমতি শচীর উদয়ে, ঈর্ষা-বিষ-দাহ জ্বলিল হৃদয়ে,
শচীরে নেহারি অধীর দুঃখে।

ঈর্ষান্বিতা ঐন্দ্রিলা শচীপদতলে পুত্রবধূ ইন্দুবালাকে দেখিয়া আরও জ্বলিয়া গেলেন। তিনি শচীবক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পদাঘাতের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় শিবদূত বীরভদ্র আসিলে সকল গোলমাল মিটিয়া গেল। বৃত্র-নিধন যে অতি সন্নিকট তাহা ঐন্দ্রিলাকে শুনাইয়া, বীরভদ্র শচীকে সুমেরু-শিখরে লইয়া গেলেন। ইন্দুবালাও শচীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

হাসিল ত্রিদিব শচী পদতলে, ত্রিদিব কুসুম দলে দলে দলে
লুটিতে লাগিল ফুটিয়া ফুটিয়া, যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া
চিরদিন তরে রাখিবে সেথা।

উনবিংশ সর্গ। এই সর্গে দধীচির অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালায় ইন্দ্রের আগমন ও বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক বজ্র নির্ম্মাণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্র বলেন—"হেমবাবুর কবিতা সর্ব্বত্র সমান শক্তিশালিনী। সেই বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালায় তাঁহার সঙ্গে প্রবেশ করিলে আমাদিগের নিঃশ্বাস রুদ্ধ

হইয়া যায়—কর্ণ বধির হইয়া যায়। অগ্নির গর্জ্জনে, মুদ্গরের আঘাতে, ধুমের তরঙ্গে, ধাতুনিঃস্রবের রবে, মহাকোলাহল—আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা সত্য সত্যই দেবশিল্পীর কারখানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই সর্গ কবির কল্পনাশক্তির এবং মৌলিকতার বিশেষ পরিচয়স্থল। * * অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহার মহিমার পরিচয় দেওয়া যায় না।"

এই সর্গে বজ্র নির্ম্মিত হইল এবং তাহাতে ত্রি-দেবের তিন শক্তি প্রবেশ করিল—

"—অকস্মাৎ তিন দিক হতে.
দীপ্ত করি শিল্পশালা তিন মহাতেজঃ,
লোহিত শ্যামল শ্বেত বরণ সুন্দর,
জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্রমধ্যে প্রবেশিলা।
প্রণমিলা পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি,
স্মরি বিধি বিষ্ণু হরে, তখনি গভীর
গরজিল ভীমনাদে দম্ভোলি ভীষণ।
দেব শিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রখর তেজে
না পারি ধরিতে অস্ত্র এবে গুরুভার
ছাড়ি দিল অকস্মাৎ ঘন ঘন ঘন
কাঁপিল ধরণী কেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে।"

বিংশ সর্গ। এই সর্গে রুদ্রপীড়ের রণ। রণে দেবগণ পরাভূত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, "পিতা পুত্র দোঁহে অজেয় রণে।" স্বর্গদ্বার হইতে বিতাড়িত ভগ্নোৎসাহ দেবগণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, ইন্দ্র বিনা যদি যুদ্ধজয় অসম্ভব হয়, তবে যুদ্ধ করিয়া লাভ কি? ভাস্কর পরামর্শ দিলেন, যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সকলে প্রলয় মুর্ত্তি ধারণ করুন, কিংবা ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় উপস্থিত করা হউক—

দ্বাদশ প্রচণ্ডরূপে জ্বলি আমি, জ্বলুন কালাগ্নি বেশে বহ্নিস্বামী
প্রলয় প্লাবন ছুটান বারীশ, পবন উড়ান ঝড়ে দশ দিশ,
দেখি কিনা দৈত্য নিধন হয়।"

কিন্তু দৈত্যের বিনাশ সাধনের জন্য ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট করা দেবোচিত কার্য্য নহে বলিয়া বরুণ দেবগণকে নিরস্ত করিলেন। যখন দেবগণ এইরূপ পরামর্শে ব্যাপৃত তখন হঠাৎ ইন্দ্রের আবির্ভাব হইল :—

হেনকালে শূন্যে ভৈরব নির্ঘোষ, কোদণ্ড টঙ্কারে, যুড়ি শতক্রোশ
ঘন সিংহনাদে পুরে শূন্য দূর, ঘন সিংহনাদে পুরে সুরপুর,
অমর দানব শূন্যেতে চায়,

দেখে ইন্দ্রধনু—গগন জুড়িয়া, শোভে মেঘশিরে দুলিয়া দুলিয়া,
নামে ধীরে ধীরে দেব অংশুল, মস্তক বেড়িয়া কিরণ মণ্ডল,
চিরপরিচিত সুনীল তনু।

একবিংশ সর্গ। সঞ্জীবচন্দ্র বলেন, "একবিংশ অধ্যায় অতি উচ্চশ্রেণীর কাব্য। জগন্মাতা রুদ্রাণী এবং ত্রি-দেব ইহার অভিনেতৃগণ। রুদ্রাণী, ইন্দ্রাণীর অপমানে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া বৃত্রবধের পরামর্শ জন্য ব্রহ্মার সদনে গেলেন। ব্রহ্মলোকের বর্ণনা অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ:—

দেখিলা সে মহাশূন্যে, অনন্ত ব্যাপিয়া,
কিরণ মণ্ডলাকার বিপুল পরিধি,
ব্রহ্মার পুরীর প্রান্তরেখা শোভাময়
অদ্ভুত আলোকে। নীল অনন্তের কোলে
নিরন্তর খেলে যেন ভানুর হিল্লোল,
বিবিধ সুবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া।

* * *

চারিদিকে
ঘেরি সে মহামণ্ডল কিরণ পূরিত
পার্শ্ব নিম্ন ঊর্দ্ধদেশে অপূর্ব্ব মূরতি
নবীন ব্রহ্মাণ্ড রাজি সতত নির্গত।

দেখিলেন জগদম্বা প্রফুল্ল অন্তরে
সে ব্রহ্মাণ্ডকুলগতি অকুল শূন্যেতে,
কতদিকে কতরূপে কত শোভাময় !
ভেদি সে ভানুমণ্ডল প্রবেশিলা সতী
বিশ্বমোহকর ব্রহ্মলোক মধ্যভাগে।

দেখিলা সেখানে সীমাশূন্য মহাসিন্ধু-
সদৃশ-বিস্তার---স্রোত-পারাবার ঘোর।
তরঙ্গিত সদা ঘূর্ণ্যমান ঊর্ম্মিরাশি
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্ত্তে ঘুরিছে
বিধাতার আসন ঘেরিয়া। নিরাকার,
নির্ঘ্রাণ, নির্জ্যোতিঃ, আভাহীন, তাপশূন্য,
সে স্রোতঃ ঊর্ম্মির, সিন্ধু ঊর্দ্ধদেশে তার
বাষ্পরাশি সূক্ষ্মতম মণ্ডলে মণ্ডলে—
যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে—অচিন্ত্য মানসে,
অচিন্ত্য কবি কল্পনে---সে বাষ্পমণ্ডলী
আবর্ত্ত ভিতরে কোটী আবর্ত্ত যেন বা !
জনমি তাহার মৃদু আলোক মণ্ডল
ব্যাপিছে অনন্ত-তনু-কেন্দ্র আভাময় !
আভাময় সূক্ষ্মতর তরল কিরণ
সে কেন্দ্রের চারিধারে, দূরতর যত

তত গাঢ়তর দৃঢ় পরমাণু ব্রজ
বায়ু, বহ্নি, বারি, ধাতু, মৃৎপিণ্ডরূপে !
ছুটিছে অনন্ত পথে সে পিণ্ড কলাপ
সূর্য্য, চন্দ্র ধূমকেতু, নক্ষত্র আকারে
নানা বর্ণ নানা কায়---অপূর্ব্ব নিনাদে
পূরিয়া অম্বরদেশ ; কোথাও ফুটিছে
মনোহরা মনুজ-ভুবন মোহময় !
বিরাজে সে উর্ম্মিময় অকূল অর্ণবে
বিধির সৃজনাসন অচিন্ত্য নিগমে !
চারিধারে সে আসন ঘেরি নিরন্তর
ছুটিছে তরঙ্গমালা লুটিতে লুটিতে
উঠিছে আসন দণ্ডে আনন্দে খেলায়ে,
হেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি
খেলিছে আসন-পার্শ্বে, বিধি পদাম্বুজ
যখনি পরশে তায়, তখনি সহসা
সে অপূর্ব্ব স্রোতমালা জীবন মণ্ডিত,
পূর্ণ নিরমল রূপ জীবাত্মা সুন্দর---
পূর্ণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ রেখা অঙ্গে পরকাশে।
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে
সে জীব-আত্মা-মণ্ডলী. হেরেন হরষে
সৃষ্টির লীলায় শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন,
দেব-নর-প্রাণিদেহে স্নেহ সুধাধার !

লাপ্লাস বৈজ্ঞানিক যুক্তি উদ্ধৃত করিলেন, হর্বর্ট স্পেন্সর তাহার বিচিত্র ব্যাখ্যা করিলেন। ঘৃণিত বঙ্গ-দেশের একজন কবি তাহাতে কাব্যের মোহময় সুধা সিঞ্চিত করিলেন।"

ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে ও উমাকে লইলা কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব বৃত্রকৃত শচীর অপমানের কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—

আপনার কর্ম্মদোষে মজে যে আপনি,
কে রক্ষিতে পারে তারে?

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলিলেন—

"কর্ম্মফলে প্রাণীবৃন্দে উন্নতি পতন।"

এবং সকলে একমত হইয়া পরব্রহ্ম রূপ ধারণ করিলেন। তখন—

ঘোর শূন্যে হইল ঘোর ধ্বনি,—
"বৃত্রের অদৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত।"

ভাগ্যদেব প্রাক্তন লিপিতে দেখিতেছিলেন—

বৃত্রের বিশাল চিত্র সে আলেখ্য'পরে
কত শোভা বিভূষিত, কত আভাময়,
জ্বলিছে উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রদীপ্ত ছটায়
ত্রিভুবন প্রজ্বলিত।

আকাশবাণীর পর—

দেখিলা সহসা,
বৃত্রের বিশাল চিত্র কালিমা মণ্ডিত
মিশাইছে ধীরে ধীরে শোভা বিরহিত !

দ্বাবিংশ সর্গ। সর্গারম্ভে—

বসিয়া অসুর পার্শ্বে অসুর-ভামিনী
নবীন নীরদ রাশি, লুকায়ে বিজুলি হাসি
বুকে ইন্দ্রধনু-রেখা ঢাকিয়া মিহির,
পরশি ভূধর অঙ্গ রহে যেন স্থির !
যেন চল চল জলে নীলোৎপল দল,
প্রসারিত নেত্রদ্বয়, দৈত্যমুখে চাহি রয়
নিস্পন্দ শরীর, ধীর গম্ভীর বদন—
না পড়িলে ধারা জল জলদ যেমন।

বৃত্র বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—

চিত্তে নাই সুখোচ্ছ্বাস, মুখে নাই প্রীতিভাষ,
পুত্রের কল্যাণে নাই মঙ্গল কামনা,
এ হেন মনের খেদে কেন হে বিমনা ?

* * *

জননীর মনস্তাপে পুত্রে অকল্যাণ—
সে কথা বিস্মৃতি-জলে, ভাসায়ে হৃদয় তলে
বিষাদে আশ্রয় দিলে কি হেন ভাবনা ?

ঐন্দ্রিলা অতিশয় চতুরা—

"খলের চাতুরী মায়া, বহুরূপী দেহচ্ছায়া
ধরে কত রূপ তাহা কে বুঝিতে পারে ?"

তিনি দুঃখের মায়াকান্না কাঁদিয়া কহিলেন—

কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয় ?
সন্তানের মমতায় কত ব্যথা চিন্তা তায়,
কত দিকে ধায় চিত্ত ? হে দৈত্যভূষণ,
পুরুষ বুঝে কি কভু রমণীর মন ?

তিনি বলিলেন শচী তাঁহার পুত্রবধূ ইন্দুবালাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে—ইহাতে বৃত্রের অপমান করা হইয়াছে।

স্বামীর কুখ্যাতি যায়, নারীর কলঙ্ক তায়,
ভাবি তাই সে কলঙ্ক ঘুচাব কেমনে।

অতঃপর সুমেরুশিখরে ইন্দুবালাকে লইয়া শচী নির্ব্বিঘ্নে কিরূপে অধিষ্ঠান করিতেছে, ঐন্দ্রিলা ক্রুদ্ধ অসুরকে তাহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। বৃত্র দেখিবার জন্য অমরার প্রাচীরে উঠিলেন। তখন দেবাসুরে মহাযুদ্ধ বাধিয়াছে। রুদ্রপীড় অপূর্ব্ব সংগ্রামে দেবগণকে বিমুখ করিতেছেন। এমন সময় বৃত্র প্রাচীরে উঠিলেন—

দেখিল অসুর সুর প্রাচীর শিখরে
গাঢ় ঘনরাশি প্রায় বৃত্রাসুর মহাকায়
দাঁড়ায়ে বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া,
আশীর্ব্বাদ করে যেন পুত্রে সঙ্কেতিয়া।

চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে,
বিশাল ললাট স্থল, শ্রবণে বীর কুণ্ডল
ধটিনী বেষ্টিত কটি প্রস্থৃত উরস,
তিন নেত্রে অরুণের রক্তিমা পরশ।

দৈত্যেন্দ্র পুত্রকে সাধুবাদ করিয়া উৎসাহিত করিলেন :—

"মাভৈ মাভৈ" শব্দে ভীষণ নিনাদি.
কহিল দনুজেশ্বর "হের পুত্র ধনুর্দ্ধর,
ক্ষণকাল নিবার এ সুর রথিগণে,
এখনি বাহিনী সঙ্গে প্রবেশিব রণে।"

বৃত্রাসুর চলিয়া গেলে রুদ্রপীড় দেবগণকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। সারথি ইন্দ্রের নিকট রুদ্রপীড়ের মৃতদেহ অমরায় লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে ইন্দ্র কহিলেন—

এ হেন বীরের শব পবিত্র জগতে।

এবং নিজ পুষ্পক রথে মৃতদেহ উঠাইয়া বীরোচিত সম্মানের সহিত তাহা অমরায় প্রেরণ করিলেন। এদিকে সুমেরু শিখরে বসিয়া শচী, চপলা ও ইন্দুবালা যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যখন রুদ্রপীড়-বিয়োগজনিত শোকের ক্রন্দন-কল্লোল সুমেরু শিখরে উঠিল—

শচীর শোকাশ্রুধারা বহিতে লাগিল,
সহসা বিবর্ণ তনু চপলা কাঁপিল।
জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি,
"কে পড়িল রণস্থলে, কোন রামা হৃদিতলে
আবার হৃদয়নাথ ঘাতিল আমার—
কার ভাগ্যে ভাঙ্গিল রে সুখের সংসার?"
চপলা অস্ফুটস্বরে রুদ্রপীড় নাম
উচ্চারিলা অকস্মাৎ; হৃদে যেন বজ্রাঘাত
না পশিতে সে বচন শ্রবণের মূলে
পড়িল দানব বধূ ইন্দ্রজায়া কোলে।
শুকাইল ইন্দুবালা---নিদাঘের ফুল।
হায়রে সে রূপরাশি যেন স্বপনের হাসি
লুকাইল নিদ্রাকোলে---ফুটিবে না আর।
ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার!

ইন্দুবালার কথায় হেমচন্দ্র একস্থানে বৃত্রের মুখে বলাইয়াছেন—

* * নিধনের নহে সে প্রতিমা,
হরিতে সে সুষমায় কৃতান্ত কাঁদিবে, হায়!
চিরায়ু সে ইন্দুবালা অক্ষয় রতন ;—
বিজয়ী বীরের যশঃ চিরায়ু যেমন।"

কবি করুণা, সরলতা ও পাতিব্রত্যের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপিণী তাঁহার এই মানসী প্রতিমাকে যেভাবে দেব-রাণীর অঙ্কে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা তাঁহারই প্রতিভার উপযুক্ত।

রুদ্রপীড়ের মৃত দেহ বৃত্রসভায় আনীত হইল—

উচ্ছ্বাসিল সভাস্থলে শোকের নিশ্বাস।"

ত্রয়োবিংশ সর্গ। দ্বাবিংশ সর্গে রুদ্রপীড়ের অপূর্ব্ব সংগ্রামের বিবরণে কবি যেমন বীররসের অবতারণা করিয়াছেন, ত্রয়োবিংশ সর্গে তেমনই করুণরসের প্রস্রবণ ছুটাইয়াছেন। সঞ্জীবচন্দ্র বলেন, "রুদ্রপীড়ের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া বীর বৃত্রের গম্ভীর কাতরতা এবং দ্বেষ হিংসা-পূর্ণা ঐন্দ্রিলার তেজোগর্ভ অমর্ষসূচিত রোদন উভয়ই কবির শক্তির পরিচয়ের স্থল।" মাননীয়া শ্রীযুক্তা

লাবণ্যপ্রভা সরকার মহাশয়া লিখিয়াছেন, "রুদ্রপীড়ের মৃত্যু হইলে শব দেখিয়া ঐন্দ্রিলা যে বিলাপ করিতেছে, তাহা অত্যন্ত মর্ম্মভেদী—

কে হরিলা? কারে দিলা, ওহে দৈত্যরাজ
আমার অমূল্যনিধি? হৃদয় মাণিক!
আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার
দৈত্যনাথ আনি দেহ রুদ্রপীড়ে মম।

*　　　*　　　*

এ জগৎ মাঝে
মা বলিতে ঐন্দ্রিলার কেবা আছে আর?
'ধরাসনে নহ, বৎস, জননীর কোলে,'
বলিব যখন তার মস্তক চুম্বিয়া
নিদ্রা ত্যজি তখনি উঠিবে পুত্রমম,
দৈত্যপতি এনে দাও সে ধন আমার।

কি সুন্দর! ঐশ্বর্য্যের গরিমা ও ভোগ-বিলাসের অতৃপ্ত বাসনা যে প্রাণকে পাষাণের মত কঠিন করিয়াছিল, আজ শোকের দারুণ প্রহারে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া জননীর রক্তমাংসময় স্বাভাবিক উত্তপ্ত হৃদয়ের ধারা ছুটিয়া বাহির হইয়াছে! পুত্রহন্তার প্রতি ঐন্দ্রিলার প্রতিহিংসা কি উগ্র!

কি কব হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
সংগ্রামের প্রকরণ, ঐন্দ্রিলা কামিনী !
নহিলে সে দেখাতাম কার সাধ্য হেন,
ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে ?
জ্বালাতাম ঘোর শিখা চিত্ত দহে যাহে
সেই তস্করের চিত্তে, জায়া-চিত্তে তার
জ্বালাতাম পুত্রশোক চিতা ভয়ঙ্কর,
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা ।"

পুত্রশোকাতুর বৃত্র ঐন্দ্রিলাকে বিলাপ করিতে নিষেধ করিলেন—

বিলাপি এখন,
চিত্তের উৎসাহ বেগ না হর মহিষি ।"

এবং

স্ফুরিত নাসিকা
বিস্ফারিত বক্ষঃস্থল, দাপটে সাপটি
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চৈঃস্বরে,
সাজ রে দানববৃন্দ সংহারের রণে ।"

সঞ্জীবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "এই রণসজ্জা অতিশয় ভয়ঙ্করী। পরদিন সূর্য্যোদয়ে রণ হইবে—দানবপুরীতে সেই কালরজনীতে ভীষণ রণসজ্জা হইতে লাগিল। পরদিন দানবকুল ধ্বংস হইবে। আমরা সেই ভয়ঙ্করী

রণসজ্জার কথা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না—দুঃখ রহিল। কৃতান্তের কালছায়া আসিয়া সেই পুরীর উপর পড়িয়াছে—গভীর মানসিক অন্ধকারে অসুরপুরী গাহমান হইয়াছে—কাল-সমুদ্র উদ্বেলোন্মুখ দেখিয়া কূলস্থ জন্তু সমূহের ন্যায় অসুর পুরমহিলাগণ বিত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আগামী বৃত্রসংহারের করালছায়া অসুরের গৃহে গৃহে পড়িয়াছে।"

চতুর্ব্বিংশ সর্গ। এই সর্গে বৃত্রবধ ও কাব্য সমাপ্তি। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ইন্দ্র বৃত্রসুতশরাঘাতে কাতর দেবগণকে পটগৃহে আহ্বান করিলেন। তিনি বৃত্রবধের অব্যর্থ অস্ত্র বজ্র পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মদিবা শেষ না হইলে বৃত্র নিপাত হইবে না, এক্ষণে বৃত্রকে নিবারণ করা যাইবে কিরূপে? সূর্য্য বলিলেন, তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া বজ্রনিক্ষেপ করা হউক

অদৃষ্ট লিখন
কে বলে খণ্ডিত নয়? সুযোগে সকলি
শুভফল।

ইন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু সূর্য্য কিছু ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, ইন্দ্রকে বহুনিন্দা করিয়া কহিলেন যে তিনি ভীরু, কুমেরু গহ্বরে এতদিন লুকাইয়া

ছিলেন, তাই তিনি দেবগণের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। বরুণ সূর্য্যের দর্পিত বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—

লজ্জাহীন
ভীরু যে আপনি, অন্যে ভাবে সে তেমনি।

গৃহ বিচ্ছেদের উপক্রম দেখিয়া ইন্দ্র পুনরায় শান্ত বাক্যে বুঝাইলেন—

গৃহ-বিসংবাদ
সদা অনর্থের হেতু ত্রিজগৎ মাঝে ;
বিপদের কালে মনোমিলনই সম্পদ !
কে না পারে সখ্যভাবে সম্পদ ভুঞ্জিতে ?

ইন্দ্র যখন যুদ্ধযাত্রার জন্য উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছিলেন, তখন সুহাসিনী চপলা, শচীর কুশলবার্ত্তা লইয়া তথায় আগমন করিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধ মত এইস্থানে হেমচন্দ্র লাবণ্যরাণী চপলার সহিত তেজঃকুলরাজ বজ্রের বিবাহ দিয়াছেন।

তাহার পর দেবদানবের আশ্চর্য্য রণ বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, যুদ্ধবর্ণনায় হেমচন্দ্র মধুসূদন অপেক্ষা সুপটু—

হেনকালে দুই দলে বাজিল দুন্দুভি,
নাচিল বীরের হিয়া। লহরে লহরে

সাগর-তরঙ্গ-তুল্য বিপুল বিশাল
দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া, পুনঃ মিলিয়া আবার,
চলিল দনুজ দল সেনানী চালনে!
দৈত্যধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকার!
ঝক্ঝক কিরণ চমকে অস্ত্র'পরে,
রথধ্বজা কলসে, তনুত্রে, ধনুহুলে,—
ঝকিছে কিরণোচ্ছ্বাস দিগন্ত ব্যাপিয়া!

মহাসংগ্রাম বাধিল। ইন্দ্র ও জয়ন্তের পরাভবার্থে বৃত্র শৈবশূল নিক্ষেপ করিলেন—

ছুটিল ভৈরব শূল ভীমমূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল অঙ্গে! হেনকালে হায়,
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে,
বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে, শূল মধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য কোলে!

শূল ব্যর্থ দেখিয়া বৃত্র "হা শম্ভু তুমিও বাম!" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। পরে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রণসমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিলেন—

ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি

ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষ মণ্ডলী,
ছুঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়ে।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায়— কাঁপিল জগৎ।
উজাড় স্বর্গের বন উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড! গ্রহ তারাদল
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে!
উছলিল কত সিন্ধু কত ভূমণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চূর্ণ রেণু প্রায়!
সে চীৎকারে সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র সূর্য্য শূন্য গ্রহ নক্ষত্র ছাড়িয়া
ছুটিতে লাগিল ভয়ে রোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মলোকে!—সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন! মহাকাল
শিবদূত কৈলাস দুয়ারে নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে! কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে!
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার! ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবন মুখে ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র হে সুরপতি দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র - বিশ্ব লোপ হয়।"

তখন ইন্দ্র বজ্র ত্যাগ করিলেন।

ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্যপথে
ঊনপঞ্চাশত বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে ; সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল ; দিঙ্মণ্ডল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল !
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুরপতি বিশাল শরীর,
বিশাল নগেন্দ্র তুল্য, ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে—পড়িল অসুর
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে !

বহিল নিরুদ্ধ শ্বাসে ত্রিভুবন ঘুড়ি।
বহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়
"হা বৎস হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে,
মুদিল নয়নত্রয় দুর্জ্জয় দানব !

এইরূপে স্বর্গজয়ী বীর বৃত্র তাহার দাম্ভিকতা ও অত্যাচারের প্রতিফল পাইল। আর ঐন্দ্রিলার কি হইল? তাহার পরিণাম কবি কাব্যশেষে তিনটি ছত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কি ভীষণ—

দহিল ঐন্দ্রিলা চিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে

চিরদীপ্ত চিতা যথা! ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে।•

এইস্থানে বৃত্রসংহার সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথমখণ্ড পাঠের পর বাঙ্গালী পাঠক সম্প্রদায় যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা যে অতিমাত্রায় পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। হেমচন্দ্র পূর্ব্বেই বাঙ্গালার তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বৃত্রসংহার সম্পূর্ণ হইবার পর ইহা সকলের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, তিনি যে কেবল তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান কবি তাহাই নহে, তাঁহার আসনের সমীপবর্ত্তী হইতে পারেন এরূপ কবিও শীঘ্র জন্মগ্রহণ করিবেন না।

আমরা এপর্য্যন্ত কেবল পাঠকগণের সহিত বৃত্র-সংহার পাঠ করিয়া আসিয়াছি—সমালোচকের দৃষ্টিতে তাহার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখি নাই। অনেক জিনিষ, যাহা দূর হইতে দেখিতে সুন্দর, সূক্ষ্মভাবে দেখিলে তাহা বহুদোষের আকর বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু বৃত্রসংহার সেরূপ কাব্য নহে। বৃত্রসংহার সমালোচনার ধৃষ্টতা বা ক্ষমতা আমাদিগের নাই,

কিন্তু যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি সূক্ষ্মসমালোচনা-শক্তির জন্য চিরদিন বাঙ্গালায় বরণীয় থাকিবেন, তাঁহারা সকলেই সমস্বরে এই কাব্যের প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে তাঁহাদিগের অভিমতগুলির আলোচনা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:*:—

সমালোচনায় 'বৃত্রসংহার'

তুলনামূলক সমালোচনা। আমাদের দেশে যে ক্ষুদ্র জনপদে কতকগুলি জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় অট্টালিকামাত্র বর্ত্তমান আছে, সেখানে যদি কেহ পাশ্চাত্য আদর্শে একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মিত করেন, তাহা হইলে জনসাধারণ স্বভাবতঃই প্রথমে বিপুল বিস্ময়ে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকে। যাঁহারা নূতনত্ব ভালবাসেন, তাঁহারা পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকাগুলির প্রতি একবারও চাহিয়া দেখেন না, থাকুক তাহাতে আমাদের জাতীয় সভ্যতার অভিব্যক্তি, আমাদের জাতীয় আদর্শের নিদর্শন, আমাদের জাতীয় প্রতিভার স্ফূর্ত্তি। তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের অভিজ্ঞতার ও সাধনার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া নূতন আদর্শের প্রশংসায় আত্মহারা হন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা ধীর, বিচক্ষণ এবং সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা সহজে আত্মহারা হন না। নূতন পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত বলিয়াই তাঁহারা উহার সর্ব্ববিষয়ক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না। পাশ্চাত্য রুচি প্রাচ্য রুচি হইতে বহু

বিষয়ে বিভিন্ন। তাঁহারা হয়ত স্বীকার করিবেন যে নূতন প্রাসাদের কক্ষগুলি সুপ্রশস্ত, উহাতে আলোক ও বায়ুর গতি অনাহত, কিন্তু তাঁহারা হয়ত ইহাও জিজ্ঞাসা করিবেন যে "প্রাসাদটী কি আমাদিগের জাতীয় রুচির অনুযায়ী এবং ব্যবহারোপযোগী? উহাতে চণ্ডীমণ্ডপ কোথায়, পূজার দালান কোথায়, অতিথিশালা কোথায়? সাহেবী ফ্যাশানের বাটীতে সাহেবীভাবে থাকিলে বাস করা চলে, কিন্তু জাতীয় আচার ব্যবহারাদি রক্ষা করিতে গেলে উহাতে ত চলে না। উহা নয়নাভিরাম হইতে পারে, কিন্তু উহাতে আমাদিগের কাজ চলে না।"

উভয় পক্ষের বিরোধের মধ্যে যদি আর কোনও শিল্পী অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের সুনিপুণ সংমিশ্রণে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করেন এবং সেই আদর্শানুযায়ী এক বিচিত্র ব্যবহারোপযোগী প্রাসাদ নির্ম্মিত করেন, তাহা হইলে জনসাধারণের মনে প্রথমতঃ তাদৃশ বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না। যাঁহারা সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন না তাঁহারা বলিয়া উঠেন, "এরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ আর কি এমন শক্ত কাজ? এই ত সেদিন একজন একটি প্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়া গিয়াছেন,

এ তাঁহার 'দেখা-দেখি' তৈয়ারী করা হইয়াছে বইত নয়।" কিন্তু যে দুই চারিজন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক অভিনিবেশ সহকারে এই শিল্পীর কার্য্য নিরীক্ষণ করেন তাঁহারা সেই শিল্পীর প্রতিভার যথোচিত সমাদর করেন। দ্বিতীয় প্রাসাদটি যে প্রথম প্রাসাদটীর অনুকরণে প্রস্তুত নহে তাহা তাঁহারা জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন এবং প্রথমটির কি কি অভাব ছিল দ্বিতীয়টিতে সেই সেই অভাব কিরূপ বুদ্ধি ও কৌশলে নিরাকৃত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত করিয়া শেষোক্ত শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করেন।

মানবসমাজ পরিবর্ত্তনশীল। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানুষ যে বাটীতে সুখে বাস করিত, এক্ষণে তাহাতে বাস করিতে পারে না। প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব দূর করিবার জন্য নূতন আয়োজন করিতে হইতেছে। সকল বিষয়ে আদর্শ দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

যদি একটা বাঁধা ধরা আদর্শ থাকিত, তাহা হইলে তাহার সহিত তুলনা করিয়া আমরা বলিতে পারিতাম এই প্রাসাদটি কতদূর আদর্শানুযায়ী হইয়াছে। কিন্তু যেখানে আদর্শ পরিবর্ত্তনশীল সেখানে যে প্রাসাদটি

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত তাহার সহিত নবনির্ম্মিত প্রাসাদটীর তুলনা করিয়া দেখি কোন্‌টি কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

মধুসূদন যখন মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেন, তখন পাশ্চাত্য 'এপিক্' কাব্যের আদর্শে রচিত এই তথাকথিত মহাকাব্যখানি দেখিয়া জনসাধারণ বিস্মিত হইয়াছিল। পরে যখন হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' প্রকাশিত হয়, তখন জনসাধারণ তাদৃশ বিস্মিত হয় নাই। যাঁহারা না পড়িয়া সমালোচনা করেন কিংবা যাঁহারা হেমচন্দ্রের প্রতি অহেতুকী ঈর্ষাবশতঃ অন্ধপ্রায়, তাঁহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "উহাতে আর নূতন বস্তু কি আছে? হেমচন্দ্র ওস্তাদ মাইকেলের অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং সকল অনুকারীর ন্যায় বৃত্রসংহার রচয়িতার স্থান মেঘনাদবধ রচয়িতার নিম্নে।" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বরদাচরণ প্রভৃতি সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকগণ 'বৃত্রসংহারে' এমন কিছু দেখিতে পাইয়াছেন যাহা মেঘনাদবধে নাই, বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব এবং যাহাতে বিশ্ববাসী মাত্রেরই উপভোগ্য মহাকাব্যের চিরন্তন অমৃতরস অভিসিঞ্চিত আছে।

'মেঘনাদবধ' ও 'বৃত্রসংহারে'র তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা বিখ্যাত মনীষিগণ কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আমরা তাহা দেখিব।

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন, "হেমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে মধুসূদনের সহিত হেমচন্দ্রের তুলনা করা কর্ত্তব্য।" আমরা এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত। কারণ মহাকাব্য প্রণয়নে মাইকেল ভিন্ন আর কোন আধুনিক কবি হেমচন্দ্রের সহিত ক্ষণমাত্র তুলনীয় নহেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যাহাই বলুন না কেন, স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" প্রকাশের পর নবীনচন্দ্রকে মহাকবির আসনে বসাইতে কেহ যে নিষ্ফল চেষ্টা পাইবেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাকাব্যের স্বরূপ। তুলনা করিতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, 'মেঘনাদ বধ' ও 'বৃত্রসংহার' একজাতীয় কি না? সাধারণতঃ উভয় কাব্যকেই মহাকাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়। কিন্তু মহাকাব্য কাহাকে বলে?

পাশ্চাত্য এপিক্ কাব্যের তিনটী প্রধান লক্ষণ

আছে। বর্ণিত বিষয়টি (১) এক হইবে (২) মহান্ হইবে (৩) উপাদেয় হইবে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ প্রাচ্য মহাকাব্যের লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
সদ্বংশঃক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।
শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে॥
অঙ্গানি সর্ব্বেঽপি রসাঃ সর্ব্বে নাটকসন্ধয়ঃ।
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্॥
চত্বারস্তত্রবর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলং ভবেৎ।
আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা॥
ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্ত্তনম্।
একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ॥
নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ।
নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে॥
সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ।
সন্ধ্যাসূর্য্যেন্দুরজনীপ্রদোষধ্বান্তবাসরাঃ॥
প্রাতর্মধ্যাহ্নমৃগয়াশৈলর্ত্তুবনসাগরাঃ।
সম্ভোগবিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গপুরাধ্বরাঃ॥



শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রণপ্রয়াণোপযমমন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ।
বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ॥
কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেত রস্য বা।
নামাস্য সর্গোপাদেয় কথয়া সর্গনাম তু॥

—ইতি সাহিত্যদর্পণম্।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় সাহিত্য-দর্পণকারের উপরিলিখিত লক্ষণগুলি এই :—

"কাণ্ডবিভক্ত কাব্যশাস্ত্র বিশেষকে মহাকাব্য বলে। উহার একটি নায়ক, হয় দেবতা হইবে, নয় ধীরোদাত্ত-গুণান্বিত কোন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় হইবে। সৎকুলোদ্ভব একবংশজাত কতকগুলি রাজাও উহার নায়ক হইতে পারে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্তি এই কয়টি রসের মধ্যে একটি রস উহার অঙ্গী এবং অন্য রসগুলি উহার অঙ্গ হইবে। উহাতে সমস্ত নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকিবে। বৃত্তান্তটি ইতিহাসোদ্ভব বা সজ্জনাশ্রয় হইবে। উহাতে সমস্ত চতুর্ব্বর্গ ফল কিংবা কোন একটি ফল থাকিবে। উহার আদিতে নমস্কার আশীর্ব্বাদ কিম্বা বস্তুনির্দ্দেশ থাকিবে। কখন কখন খলাদির নিন্দাবাদ ও সাধু-দিগের গুণকীর্ত্তনে উহার আরম্ভ হয়। সমস্ত পদ্যে একটি ছন্দ থাকিবে, কেবল অবসানে অন্য ছন্দ হইবে।

কখন কখন উহাতে নানা ছন্দোময় সর্গ দৃষ্ট হয়। উহা নাতিস্বল্প ও নাতিদীর্ঘ হইবে। উহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে। সর্গান্তে ভাবী সর্গের কথাসূচনা থাকিবে। সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, ঋতু, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিচ্ছেদ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রজন্ম ইত্যাদি বিষয় যথাযোগে ও সাঙ্গোপাঙ্গরূপে উহাতে বর্ণিত হইবে। কবির নামে, কিম্বা বৃত্তান্তের নামে, কিম্বা নায়কের নামে কাব্যের নাম হইবে। সর্গের মধ্যে যে কথা সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়, তাহারই নামে সর্গের নাম হইবে।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যদর্পণকারের নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন, "উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে মহাকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ কি, তাহার মর্ম্মগত তাৎপর্য্য কি, তাহার প্রাণগত ভাব কি—সে বিষয়ের কোন কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না—উহাতে কেবল বাহ্য আকার ও বাহ্য উপকরণের কথাই আছে।"

কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুনশ্চ লিখিয়াছেন, "এপিক্ কাব্যের যে সকল লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হই-

য়াছে, তাহাতে দেখা যায়, এপিক্ কাব্যগত বিষয়টি এক হইবে, মহান্ হইবে এবং উপাদেয় হইবে। যদিও সাহিত্যদর্পণকার ঠিক এইরূপ কথায় মহাকাব্যের লক্ষণ দেন নাই, তথাপি তাঁহার বিবৃত লক্ষণগুলি হইতে য়ুরোপীয় এপিকের সার মর্ম্মটি কোন প্রকারে উদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি নায়ক ও বৃত্তান্ত বিষয়ের যেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে মহৎ অনুষ্ঠান ও মহৎ বিকাশ আপনা হইতেই সূচিত হইতেছে। তিনি যে বলিয়াছেন, মহাকাব্যে নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকা চাই, উহাতে য়ুরোপীয় এপিক্ কাব্যের কার্য্যগত একত্বও সূচিত হইতেছে। তাহার পর সাহিত্যদর্পণে যে আছে ঃ—সন্ধ্যা, চন্দ্র, সূর্য্য, রণপ্রয়াণ প্রভৃতি বিষয় মহাকাব্যে বর্ণনীয়—তাহার তাৎপর্য্য এই, একটি মহৎ ব্যাপারের বর্ণনা করিতে গেলে এবং সেই বর্ণনা উপাদেয় করিতে হইলে কাব্যমধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করা আবশ্যক।"

মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' প্রাচ্য মহাকাব্যের আদর্শে রচিত হয় নাই। উহা পাশ্চাত্য এপিক্ কাব্যের আদর্শেই রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। য়ুরোপীয় এপিকের 'লক্ষণানুসারে

মেঘনাদবধের সমালোচনা করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন :—

(১) উহাতে কাব্যগত বিষয়ের একত্ব নাই। "মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের বধ সাধনা কিম্বা শক্তি শেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবন লাভ উহার কোন্‌টি কাব্যগত বিষয় তাহা বুঝা নাও যাইতে পারে। কারণ কবি, মেঘনাদের বধসাধন করিয়াই কাব্যের উপসংহার করেন নাই, তাহার পরেও লক্ষ্মণের শক্তিশেলের ঘটনা আনিয়া এবং রামকে নরক পরিভ্রমণ করাইয়া অনেকটা নিরর্থক বাড়াইয়াছেন। অ্যারিষ্টটলের নিয়মানুসারে ইহাতে কাব্যগত একত্বের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়াছে বলিতে হইবে।"

(২) বর্ণিত বিষয়ের মহত্ত্ব নাই। "কবি, লক্ষ্মণ কিম্বা রামকে নায়ক না করিয়া রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে নায়করূপে নির্ব্বাচন করায় তাঁহার কাব্যগত মহত্ত্ব ও গৌরবের বিশেষ হানি হইয়াছে সন্দেহ নাই। রাবণ কিংবা ইন্দ্রজিৎ পাশব বীরত্বেরই আদর্শস্থল, কিন্তু যে বীরত্বের সহিত ক্ষমা দয়া ন্যায় বাৎসল্য ভক্তি মিশ্রিত, সেই বীরত্বগুণে ভূষিত উন্নতচরিত্র মহাপুরুষই মহাকাব্যের উপযুক্ত নায়ক হইতে পারেন। মূলগ্রন্থে যে

সকল চরিত্র উন্নত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কবি আরও উন্নত করিয়া চিত্রিত করুন তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেই মূলগ্রন্থের বর্ণিত উন্নত-চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আঁকিবার তাঁহার কি অধিকার আছে? বিশেষতঃ যাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী—চির আরাধ্য দেবতা—সেই রামলক্ষ্মণকে এরূপ হীনবর্ণে চিত্রিত করা কি সহৃদয় জাতীয় কবির উচিত? রামলক্ষ্মণ থাকিতে মেঘনাদকে কিছুতেই নায়ক করা যাইতে পারে না—মহাকাব্যের উপযুক্ত অত বড় মহান চরিত্র রামায়ণে কেন, মহাভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কাব্যে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তাঁহাদিগকে ছাঁটিয়া রাবণ কিংবা মেঘনাদকে নায়ক করিবার ত কোন অর্থ ই পাওয়া যায় না।”**“আসল কথা, চরিত্রের মহত্ত্ব বিকাশ—যাহা মহাকাব্যের প্রাণ তাহা মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়?”

(৩) বর্ণনার উপাদেয়তা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন, “মেঘনাদবধ কাব্যের যতই দোষ থাকুক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উহা সুখপাঠ্য। * * কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমরা উহা হইতে যে

আমোদ পাই—সাধারণ মানবপ্রকৃতিসুলভ আড়ম্বর-প্রিয়তাই তাহার কারণ। রাজপথে ঘোর ঘটা করিয়া, বাদ্য বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, লোকের কোলাহলে আকাশ পূর্ণ করিয়া, যখন চাকচিক্যময় গিল্টির সাজে সুসজ্জিত কোন প্রতিমাকে বাহির করা হয়—তখন যেরূপ সেই দৃশ্য সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে ও তাহাতে তাহারা আমোদ পায়—মেঘনাদবধ কাব্য পড়িয়া অনেক সময়ে আমরা যে আমোদ পাই, সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ঐ প্রকারের আমোদ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। উহাতে সহজ কবিত্বের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস অতি বিরল, কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ অলঙ্কারে উহা পরিপূর্ণ। কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমোদ পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে আমোদ উচুদরের নহে, উহা চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না।"

যাঁহারা অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী তাঁহারা সকল সময়ে চিরনির্দ্দিষ্ট পথে চলেন না, তাঁহারা তাঁহা-দের অপূর্ব্ব শক্তিদ্বারা নূতন নূতন পথ প্রস্তুত করেন, সুতরাং মহাকাব্যের চিরনির্দ্দিষ্ট বাহ্য লক্ষণগুলি নাই বলিয়া কিংবা অতি অল্প মাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া

মেঘনাদবধকে মহাকাব্য পর্য্যায়ভুক্ত না করিলে সুবিচার করা হইবে না। মহাকাব্যের প্রাণ কোথায় এবং সেই প্রাণ 'মেঘনাদবধে' আছে কি না তাহা দেখিতে হইবে। প্রতিভার বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না ; তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন একজন পরম পুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্য চরিত্রের উদার মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরম পুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকেন ; সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দ্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে! সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য কিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য! * * *

"কিন্তু আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা

করিয়া মহাকাব্য লেখেন, তাঁহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন; রাশি রাশি খঁট মট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই যুদ্ধ বর্ণনা মাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন। হয়ত কবি স্বয়ং শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন আনাড়িও অনেক আছে, যাহারা পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলিয়া থাকে।*

"হেমবাবুর বৃত্র-সংহারকে আমরা এই রূপ নামমাত্র-মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে

* নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' পাঠে এ বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ জন্মিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বৃত্রসংহারের নিম্নে পলাশীর যুদ্ধের স্থান নির্দ্দেশ করায় নবীনচন্দ্র বিশেষ প্রীত হন নাই এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যখন নবীনচন্দ্রকে পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করেন "আপনি পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য কি খণ্ড কাব্য বলেন?"—তখন নবীনচন্দ্র অভিমান করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমি উহাকে অকাব্য বলি।"

পারি না। মহাকাব্যের সর্ব্বত্রেই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ আট নয় সর্গ ধরিয়া সাত আটশ পাতা ব্যাপিয়া প্রতি-ভার স্ফূর্ত্তি সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারেই না। এই জন্যই আমরা মহাকাব্যের সর্ব্বত্র চরিত্র-বিকাশ, চরিত্র-মহত্ত্ব দেখিতে চাই। মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে—কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে! যে একটি মহান্ চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তৃত রাজ্যের মধ্যস্থলে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে,যাহার শুভ্র-তুষার-ললাটে সূর্য্যের কিরণ প্রতি-ফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও না কবিত্বের শ্যামল কানন, কোথাও বা অনুর্ব্বর বন্ধুর পাষাণস্তূপ, যাহার অন্তর্গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্ত্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়? কতকগুলি ঘটনাকে সুসজ্জিত করিয়া ছন্দোবন্ধে উপন্যাস লেখাকে মহাকাব্য কে বলিবে? মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।

"হীন, ক্ষুদ্র, তস্করের ন্যায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করা, অথবা পুত্রশোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটুকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এতদূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একটি মহা-কাব্য লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান, এবং অধর্ম্মের ফলে বৃত্রের সর্ব্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, একটা জয় পরাজয়মাত্র কখন মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধ্বংস ঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয়-গৌরব কীর্ত্তিত হয়—গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরব কল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনার কোন্‌খানে সেই উদ্দীপনী শক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ

চরিত্রও নাই। কার্য্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনাই নাই, সেখানে কি আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাঁড়াইতে পারিবে? মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদ-বধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন কি ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। মেঘ-নাদবধ কাব্যের কোন পাত্র আমাদের সুখ দুঃখের সহায় হইতে পারেন না, আমাদের কার্য্যের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক হইতে পারেন না। কখন কোন অবস্থায় মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না। পদ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই—চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখ। প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে,—চন্দ্রশেখরের চরিত্রে অমরতা আছে,—যখন মেঘনাদবধের রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চিরস্তব্ধ সমাধি-ভবনে শায়িত, তখনো প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিবে! * * *

"আর একটা কথা বক্তব্য আছে—মহৎ চরিত্র যদি বা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন—তবে কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র

বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ? কবি বলেন 'I despise Ram and his rabble' সেটা বড় যশের কথা নহে—তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতর প্রকৃতি-বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে ? ধূমকেতু কি ধ্রুব-জ্যোতি সূর্য্যের ন্যায় চিরদিন পৃথিবীকে কিরণদান করিতে পারে ? সে দুই দিনের জন্য তাহার বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কা-বর্ষণ করিয়া বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন্ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে!

"এ-কটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, মেঘনাদ বধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষ্য চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কল্পনায় উদিত হইলে; তিনি তাহা আর এক ছাঁদে লিখিতেন।

তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চখের সমুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাঁহার কাব্যারম্ভে যে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই আহ্বান-সঙ্গীত তাঁহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি। হোমর তাঁহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করিয়া যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল;—মাইকেল ভাবিলেন মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন, অমনি সরস্বতীর বন্দনা সুরু করিলেন। মাইকেল জানেন, অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ নরক বর্ণনা আছে, অমনি জোর জবরদস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায় ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস এক স্বর্গ নরক বর্ণনার অবতারণা করিলেন। মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর, পীড়িত, কল্পনার কাছ হইতে টানা হেঁচড়া করিয়া গোটা কতক দীন দরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য

যতপ্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? যিনি পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান খুলিয়া মহাকাব্যের একটা কাঠাম প্রস্তুত করিয়া লিখিতে বসেন; যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া, সহজভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া, পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন—তাঁহার রচিত কাব্য লোকে কৌতূহলবশতঃ পড়িতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় অনন্যপূর্ব্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানী বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয়দিন? কাব্যে কৃত্রিমতা অসহ্য, এবং সে কৃত্রিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না!

"আমি মেঘনাদ বধের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া, তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম, তাহা মহাকাব্যই নয়।"

'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়

আমরা কিছু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিলাম। আমরা পাঠকগণের সহিত একত্র বৃত্রসংহার পাঠ করিয়াছি, এক্ষণে বৃত্রসংহারের আর কোনও বিশেষ পরিচয় না দিলেও উপরি উদ্ধৃত সমালোচনা পাঠে তাঁহারা নিশ্চয়ই মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহারের জাতিগত পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধের ন্যায় বৃত্রসংহারকে কেন নামমাত্র মহাকাব্য বলিয়া মনে করেন না, তাহাও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন, "কিবা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের সুপরিচিত পুরাতন সূত্র, কিবা ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অধুনাতন বিচার-ব্যবস্থা,—যেদিকে দৃষ্টি কর, যে দেশের সাহিত্যসমালোচকদিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মানিয়া লও, বৃত্র-সংহার সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাকাব্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন একখানি মহাকাব্য আর কোন দিনও ফুটে নাই; ভবিষ্যতে যে ফুটিবে এমন বেশী আশা নাই। যে সকল কাব্য ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য বলিয়া সম্মানিত, তাহারও সকল খানিতেই বৃত্র-সংহারের তুলনা নাই।"

ছন্দঃ। হাতী ও ঘোড়ার তুলনা হয় না। 'মেঘনাদ-বধ' ও 'বৃত্র-সংহারে'র জাতিগত পার্থক্য স্বীকার করিলে আর তুলনা করা উচিত নহে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র, রবীন্দ্র ও কালীপ্রসন্নের অভিমতও সর্ব্বজনগ্রাহ্য না হইতে পারে। যাঁহারা তাঁহাদের মতের পোষকতা করেন না, তাঁহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বীকার করিয়া লওয়া গেল যে, 'লড়াই বর্ণনাই' মহাকাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং মেঘনাদবধ একটি মহাকাব্য।

প্রথমতঃ দেখা যাউক মেঘনাদবধ ও বৃত্র-সংহারের আকৃতিগত কোনও পার্থক্য আছে কি না। পুস্তক-দ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে উভয় কাব্যের ছন্দঃ এবং ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ও হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ এক নহে। মধুসূদনের যে দোষগুলি হেমচন্দ্র মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় দেখাইয়াছিলেন, সেগুলি সযত্নে বৃত্রসংহারে নিরাকৃত হইয়াছে। সুপণ্ডিত ৺বরদাচরণ মিত্র মহাশয় তদ্বিরচিত "The English Influence on Bengali Literature" শীর্ষক প্রস্তাবে যথার্থই লিখিয়াছেন "His" (Michael Madhu Sudan Datta's) defects have been corrected

without his beauties being impaired in the later works of Baboo Hem Chandra Banerjea." অধিকন্তু মেঘনাদবধে ছন্দোবৈচিত্র্য নাই, বৃত্রসংহারে ছন্দোবৈচিত্র্য আছে। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, "বৃত্রসংহারে ছন্দবৈচিত্র থাকাতে লাভ হয় নাই। ওজোগুণে ব্যাঘাত হইয়াছে। মাইকেলের কবিতা মিতাক্ষর পয়ারের পটতালে গরীয়সী হইয়াছে।" পক্ষান্তরে, চন্দ্রনাথ বসু বলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ "আমার মিষ্ট লাগে না। আমার মনে হয় ঐ ছন্দে কবিতা লিখিয়া মাইকেল একটা জঞ্জাল ঘটাইয়াছেন। সেই সেকালের পয়ার ও ত্রিপদী আমার বড়ই ভাল লাগে। কিন্তু এখন ঐ সকল সোজা সরল ছন্দ বড়ই ঘৃণিত, একরকম মূর্খের ছন্দ বলিয়া পরিত্যক্ত। হেমচন্দ্র মিষ্ট পয়ার লিখিতে পারিতেন। মাইকেলের হেঁপায় না পড়িলে বোধ হয় সমস্ত বৃত্রসংহারখানা পয়ারে লিখিয়া বঙ্গে যথার্থই বাঙ্গালীর প্রিয় একখানা বাঙ্গালা কাব্য রাখিয়া যাইতেন। আর সেই কাব্যখানাকে বাঙ্গালী জাতীয় এবং স্বদেশী কাব্যজ্ঞানে পুলকিত হইত।" দেখা যাইতেছে "ভিন্নরুচিহি লোকঃ।" ১
পাঠকগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ হওয়া বিচিত্র

নহে, কিন্তু আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, সাহিত্যগগনের যে প্রদীপ্ত ভাস্করের প্রতিভার প্রতিফলিত জ্যোতিঃতে সাহিত্যাকাশের অনেক চন্দ্র একদা জ্যোতিষ্মান হইয়াছিল এবং যাঁহার প্রতিভারশ্মিসংহরণের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক চন্দ্রের প্রতিভাজ্যোতিঃ অত্যাশ্চর্য্য ও দ্রুত ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ * অভিমতের সহিত অধিকাংশ পাঠক এক-

---

* কেহ কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার নিরপেক্ষতায় সন্দেহ করেন। সাহিত্যসেবক ৺নিত্যকৃষ্ণ বসু একস্থানে লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের একটা দুর্ব্বলতা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। তিনি যেরূপ স্বাধীনতা ও সতর্কতার সহিত অপরিচিত গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতেন, পরিচিত বা আশ্রিত লেখকদিগের সম্বন্ধে সেরূপ করিতে পারিতেন না। * * * দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্গদর্শন সম্পাদক কৃত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং গঙ্গাচরণ সরকারের সমালোচনা উল্লিখিত হইতে পারে। যেখানে এই আশ্রিতানুরাগের সম্পর্ক নাই, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিয়া কেবল সাহিত্য ও সৌন্দর্য্যের দিক্ হইতে মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন।" কিন্তুবঙ্কিমচন্দ্রের উপায় কি? গঙ্গাচরণের 'ঋতুবর্ণনে'র উচ্চ প্রশংসা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাও পিতৃভক্ত পুত্র অক্ষয়চন্দ্রের মনঃপুত হয় নাই। তাই

মত হইবেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন; "ইউরোপে একটি কুপ্রথা আছে; একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠক মাত্রেরই শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে ইউরোপীয় মহাকাব্য সকল সামান্য পাঠকেরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রাচীন প্রথাটি ভাল—সর্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্ত্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশী প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্য সকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন। হেমবাবু দেশী প্রথাটিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের বৈচিত্র্য এবং লালিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে।"

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বৃত্রসংহার সমালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,"এই পুস্তকে ছন্দ মিত্রাক্ষর ও

অক্ষয়চন্দ্র 'বঙ্গভাষার লেখকে' 'পিতাপুত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার দোষ দেখাইয়া পিতাকে certificate দিয়াছেন। ঋতুবর্ণনের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু একটি অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি হেমচন্দ্রের 'বিদ্যুৎ' ও গঙ্গাচরণের 'বিদ্যুতে'র তুলনা করিয়াছিলেন এবং উভয়ের কাব্যের পার্থক্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন;

অমিত্রাক্ষর দুইরূপই আছে। তন্মধ্যে আবার প্রকারভেদ আছে। সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ হইবে ভাবিয়া কবি অমিত্রাক্ষরছন্দের চারি পঙ্‌ক্তিতে বাক্যশেষ করিয়াছেন। ফলতঃ মেঘনাদবধের ছন্দ অপেক্ষা বৃত্রসংহারের ছন্দ অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে।"

ভাষা। মধুসূদনের কাব্যের পরম অনুরাগী স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'মেঘনাদবধ' ও 'বৃত্রসংহারে'র তুলনায় সমালোচনা করিয়া একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "বৃত্রসংহার প্রকৃতই মহাকাব্য। ইহাতে প্রেম, বীরত্ব এবং স্বার্থত্যাগের যে সকল আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অতি উচ্চ এবং অতি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। ভাবের সম্পদ বৃত্রসংহারে মেঘনাদবধের ভাবসম্পদের অপেক্ষা কম নহে, ছন্দের সম্পদও কম নহে, তবে ভাষার সম্পদ দেখিতে গেলে মেঘনাদবধ কাব্যকেই প্রাধান্য দিতে হয়।"

মেঘনাদবধে যত দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দ আছে বৃত্রসংহারে তত নাই, একথা শতবার স্বীকার্য্য। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যতপ্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, মাইকেল তাহা করিয়াছেন। কিন্তু অভি-

ধান দেখিয়া কতকগুলি দুরূহ শব্দ সংগ্রহ করিলেই কি কাব্যের উৎকর্ষবৃদ্ধি হয়? কাব্যের প্রাণ সরলতা, স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতায়, কেবলমাত্র অলঙ্কারে ও শব্দাড়ম্বরে নহে। কুৎসিতা রমণীকে অধিক অলঙ্কার পরাইলেই সে সুশ্রী হইবে না, পক্ষান্তরে যে স্বভাব-সুন্দরী সে দুই-একখানি অলঙ্কার পরিলেও সুন্দরী বলিয়া পরিগণিতা হইবে। একজন সমালোচক লিখিয়াছেন, "অর্থই বাক্যের শরীর; শব্দাদি অলঙ্কার স্বরূপ। সেই শরীরের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া অলঙ্কারের প্রতি যত্ন করা বুদ্ধিজীবি জন্তুর লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ পায় না। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, শকুন্তলা, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্যের তাদৃশ আদর কেন? আর নলোদয়ের অনাদরই বা কেন? এই প্রশ্নের আলোচনা করিলে অনায়াসে বোধ হয় যে নলোদয় শব্দের ঘটা মাত্র; তাহাতে কাব্যের লেশমাত্র নাই; এবং তন্নিমিত্তই তাহা শকুন্তলাদির তুল্য হইতে পারে নাই।"

আমাদের মনে হয়, কোনও কবির শব্দসম্পদ আছে কিংবা তিনি এ বিষয়ে দরিদ্র তাহা বিচার করিতে গেলে, তদ্বিরচিত কাব্যে কতগুলি শব্দ ব্যবহৃত

হইয়াছে, তাহা গণিবার প্রয়োজন নাই। দেখিতে হইবে শব্দের দারিদ্র্যজনিত তাঁহার ভাব প্রকাশের কোন প্রত্যবায় ঘটিয়াছে কি না। যদি রামপ্রসাদ তাঁহার গীতিকবিতায় সরল ও সহজ শব্দের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার শব্দাড়ম্বরহীনতার জন্য নিশ্চয়ই তিনি নিন্দনীয় হইবেন না। পক্ষান্তরে, যদি অভিধান দেখিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া বহু শব্দ সংগ্রহ করিয়াও কেহ ভাব প্রকাশে অক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি কেবল অধিক সংখ্যক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া অযথা প্রশংসা প্রাপ্ত হইবেন না। হেমচন্দ্র স্বয়ং 'বৃত্রসংহারে'র 'বিজ্ঞাপনে' তাঁহার সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞতার নিমিত্ত আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার উচ্চ ভাবসমূহ প্রকাশের জন্য কখনও তিনি উপযোগী শব্দের অভাব অনুভব করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। পক্ষান্তরে মাইকেল অনেক স্থলে অনুপযোগী শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে ভারতচন্দ্রের সহিত মাইকেলের তুলনা করিবার সময় মধুসূদনের কাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা উদার সমালোচক হেমচন্দ্রও, ভারতচন্দ্রের শব্দের উপর

আধিপত্যের প্রশংসা করিয়া মাইকেল সম্বন্ধে লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "বোধ হয় তিনি পদবিন্যাসকালীন কথার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করেন না।"

আদর্শের মহত্ত্ব। আমরা 'মেঘনাদবধ' ও 'বৃত্রসংহারে'র বাহিরের দিকটি—তাহাদের আকৃতি-গত বৈষম্য সম্বন্ধে—কাব্যদ্বয়ের ছন্দ ও ভাষা সম্বন্ধে—সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমরা এক্ষণে কাব্যদ্বয়ের ভিতরের দিকটি দেখিব। তাহাদের নৈতিক আদর্শ, ভাবসম্পদ ও শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন একস্থানে লিখি-য়াছেন, "হেমচন্দ্রের কবি-হৃদয় বীরজনসুলভ কঠোর-তায় ও সাধুতায় পরিপূর্ণ, ইহাই বঙ্গীয় কাব্যজগতে হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব। তাঁহার কবিতা পাষাণের মত কঠোর অকুটিল, অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, কিন্তু নীরস নহে। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে এইরূপ আর একজন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভারবি। হেমচন্দ্র একালের কবি নহেন। এই বাঙ্গালী কবির হৃদয়

প্রাচীন গ্রীক কবির উপাদানে গঠিত। তাঁহার বিষাণ একালে বাজিলেও, প্রাচীন 'হেলিকন' পর্ব্বতের আমদানী। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রাচীন হোমর, টাসো, দান্তে, পিণ্ডার প্রভৃতির সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলেন * * *
প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় তাঁহার সঙ্গীতধ্বনি অতিমানব ঘটনাবলম্বনে, উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে নিম্নস্থ জনমানবকে লক্ষ্য করিয়া ঝরিতেছে। তাঁহার সমস্ত চেষ্টায় নৈতিক লক্ষ্য ও মানব মনের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্য বিদ্যমান। হেমচন্দ্রের সাহিত্যিক আদর্শ মহান্। তিনি শুধু সরস্বতীর প্রিয়পুত্র নহেন, প্রিয় সেবক। নানা বিদেশ হইতে ধনরত্ন আনিয়া তিনি আমাদের দীনা বঙ্গভাষাকে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার সারস্বত জীবন সর্ব্বত্র মৌলিক কবিত্বময় না হইলেও, তাহা মহত্ত্বের উজ্জ্বলতায় চিরদিন উদ্ভাসিত থাকিবে।"

বাস্তবিক মধুসূদনের আদর্শ অপেক্ষা হেমচন্দ্রের আদর্শ উচ্চতর ছিল। অধ্যাপক ক্ষীরোদচন্দ্র রায় একস্থানে যথার্থই লিখিয়াছেন যে হেমচন্দ্র নিজের "অজ্ঞাতসারে চিরদিন মানবীয় উচ্চভাবের উদ্দীপনা ও উৎকর্ষে মনুষ্যকে দেবত্ব দিতে দেবদূতের

ন্যায় চেষ্টা করিয়াছেন। সূর্পণখার হাবভাব, তারার প্রণয়-লালসা, ব্রজাঙ্গনার রতিবিলাস, প্রমীলার গিরিশৃঙ্গ-সমা সুউচ্চ কুচযুগের শোভা বা অধরে মধুর হাসি হেম-চন্দ্রকে আকর্ষণ করে নাই।"

মধুসূদনের বিকৃত শিক্ষা ও আদর্শের জন্যই তাঁহার কাব্যের অপকর্ষ ঘটিয়াছে একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

চরিত্র-চিত্রণ। যেখানে মহৎ আদর্শ নাই, মহৎ অনুষ্ঠান নাই, সেখানে মহৎ চরিত্র কি আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতে পারে?

সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেন, "মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন কি ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই।"

প্রথম বর্ষের "ভারতী"তে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদ-বধে'র চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, যথাযথ চরিত্রচিত্রণে মাইকেল একবারে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা সেই বিস্তৃত প্রবন্ধ হইতে



কবিবর স্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অংশ বিশেষ উদ্ধার করিব, কিন্তু পাঠক মাত্রকেই আমরা মূল প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি, কারণ এরূপ নির্ভীক ও নিরপেক্ষ কাব্যসমালোচনা বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

মাইকেল কোনও পত্রে লিখিয়াছেন, "People here grumble and say that the heart of the poet in 'মেঘনাদ' is with the Rakhshasas! And that is the real truth. I despise Ram and his rabble, but the idea of রাবণ elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow." রবীন্দ্রনাথ বলেন, মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহাই যদি কবির কল্পনার চরম উন্নতি হইয়া থাকে, তবে তিনি কাব্যের প্রারম্ভভাগে "মধুকরী কল্পনা দেবী"র যে এত করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার ফল কি হইল?" তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, "রাবণকে মাইকেল মহান্ চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে স্ত্রী-প্রকৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন; তিনি তাহাকে কঠোর হিমাদ্রি সদৃশ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু 'কোমল সে ফুলসম' করিয়া গড়িয়াছেন।"

মেঘনাদবধের প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ রাবণ কাঁদিতেছেন—

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে,
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে"—ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ বলেন,"রাণী মন্দোদরীকে কাঁদাইতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা পড়িলেই আমাদের মনে হয় গালে হাত দিয়া একটি বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিতেছে। একজন সাধারণ নায়ক এরূপ কাঁদিতে বসিলে আমাদের গা জ্বলিয়া যায়,তাহাতে ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে সে নায়ক নয়, যিনি বাহু-বলে স্বর্গপুরী কাঁপাইয়াছিলেন এবং যাঁহার এতদূর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার চক্ষের উপরে একটি একটি করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, নিহত হইল, ঐশ্বর্য্যশালী জনপূর্ণ কনক লঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্মশানভুমি হইয়া গেল, অবশেষে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাঁহাকে এইরূপ বালিকাটির ন্যায় কাঁদাইতে বসান অতি ক্ষুদ্র কবির উপযুক্ত। ** যদি আমাদের রাবণের চরিত্র বুঝিতে হয় ত কি বুঝিব.? রাবণকে কি মন্দোদরী বলিয়া আমা-

দের ভ্রম হইবে না? কোথায় রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু শুনিয়া পদাহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিবেন, না সভা-সুদ্ধ কাঁদাইয়া কাঁদিতে বসিলেন; কোথায় পুত্রশোক তাঁহার কৃপাণের শাণ প্রস্তর হইবে, কোথায় প্রতিহিংসা তাঁহার শোকের ঔষধি হইবে, না তিনি স্ত্রীলোকের শোকাগ্নি নির্ব্বাণের উপায় অশ্রুজলের আশ্রয় লইয়াছেন! কোথায় যখন দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিবে তখন তিনি বলিবেন যে, আমার বীরবাহুর মৃত্যু হয় নাই ত, তিনি অমর হইয়াছেন, না সারণ তাঁহাকে বুঝাইবে যে "এ ভবমণ্ডল মায়াময়" আর তিনি উত্তর দিবেন "তাহা জানি তবু জেনে শুনে কাঁদে এ পরাণ অবোধ!" যখন রাবণ বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া বলিতেছেন "যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, বীর-কূল সাধ এ শয়নে সদা" তখন মনে করিলাম, বুঝি এতক্ষণে মন্দোদরীর পরিবর্ত্তে রাবণকে পাইলাম, কিন্তু তাহা নয়, আবার রাবণ কাঁদিয়া উঠিলেন। রাবণের সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহান্‌ ভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি

তাঁহার চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা দেখিয়াই বৃত্রকে প্রকাণ্ড দৈত্য বলিয়া চিনিতে পারিলাম।

"নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস।
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ ॥*
নিশান্তে গগন পথে ভানুর ছটায়।
বৃত্রাসুর প্রবেশিল তেমতি সভায় ॥
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন পরে।
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্য পদ ভরে ॥"

মেঘনাদবধের প্রথম সর্গের উপসংহার ভাগে যখন ইন্দ্রজিৎ রাবণের নিকট যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করিলেন তখন রাবণ কহিলেন, "এ কাল সমরে নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা বারম্বার" কিন্তু বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় যখন পিতার নিকট সেনাপতি প্রার্থনা করিলেন তখন বৃত্র কহিলেন—

রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে,

---

* আবার সেই "পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ"—পংক্তিটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিবার জন্য অক্ষয়চন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। রবীন্দ্রনাথও এই অংশটি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলেন ইহা নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়!

বাসনা আমার নাই করিতে হরণ,
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও,
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানব তিলক! ইত্যাদি

ইহার মধ্যে ভয় ভাবনা কিছুই নাই, বীরোচিত তেজ। মেঘনাদবধ কাব্যে অনেকগুলি "প্রভঞ্জন" "কলম্বকুল" প্রভৃতি দীর্ঘপ্রস্থ কথায় সজ্জিত ছত্র সমূহ পাঠ করিয়া তোমার মন ভারগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এমন ভাব-প্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া পাইবে। অনেক পাঠকের স্বভাব আছে যে তাঁহারা চরিত্র চিত্রে কি অভাব কি হীনতা আছে তাহা দেখিবেন না, কথার আড়ম্বরে তাঁহারা ভাসিয়া যান, কবিতার হৃদয় দেখেন না, কবিতার শরীর দেখেন।"

ভক্তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রনিরতা লক্ষ্মীর চরিত্র, ইন্দ্রজিতের ষড়যন্ত্রের সংবাদ শুনিয়া যে ইন্দ্র বলেন, "পন্নগ অশনে নাগ নাহি ডরে যত, ততোধিক ডরি তারে আমি" সেই দেবরাজের চরিত্র চিত্রিত করিতে মাইকেলের অক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। মাইকেলের চরিতকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, 'রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে কবি যেরূপ

ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগকে মর্ম্মাহত হইতে হয়।' বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে কবি বলাইয়াছেন—

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর! যুদ্ধসাজ ত্যজিনু তখনি;
মূঢ় যে ঘাঁটায় সখে হেন বাঘিনীরে।

বিভীষণকে ডাকিয়া তিনি কাঁদো কাঁদো স্বরে কহিতেছেন—

"এবে কি করিব, কহ, রক্ষকুলমণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে,
কে রাখে এ মৃগ পালে?"

লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পাঠাইতে রাম বলিতেছেন

"হায় রে কেমনে—
যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল বীরকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেববর ভস্ম যার বিষে;
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।"

"ভিখারী" রাঘব কেবলই কাঁদিতেছেন, "কেমনে ফেলিব এ ভ্রাতৃরতনে আমি এ অতলজলে?"

লক্ষ্মণ সম্বন্ধে যোগীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "কবি যে

কেবল বীরোচিত ঔদার্য্যে ও মহত্ত্বে লক্ষ্মণকে কাপুরুষবৎ চিত্রিত করিয়াছেন তাহা নয়; শারীরিক বলেও তিনি তাঁহাকে শিশুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়াছেন। ক্রুদ্ধ মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি পূজোপকরণ হইতেও আত্মরক্ষা করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। সে অবস্থাতেও

> "মায়াময়ী মায়া বাহু প্রসারণে,
> ফেলাইল দূরে সবে, জননী যেমতি
> খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে,
> করপদ্ম সঞ্চালনে।"

কবি নিরস্ত্র মেঘনাদকে লক্ষ্মণ দ্বারা যেরূপে হত্যা করাইয়াছেন তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। যোগীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, "রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র সম্বন্ধে কবি মেঘনাদবধে যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা চিরদিন তাঁহার কাব্যের কলঙ্ক ঘোষণা করিবে।"

মাইকেলের দেবচরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, "ইচ্ছাপূর্ব্বক মধুসূদন রাক্ষস-পক্ষের শৌর্য্য বীর্য্য মহিমাময় করিয়াছেন। কিন্তু রাম লক্ষ্মণ নিষ্প্রভ হইলেও মাইকেলের মহেশ-মহেশ্বরীর চিত্র

হেমচন্দ্রের ঐ সকল চিত্র অপেক্ষা অধিকতর দেবতার মত।" হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার একত্র পাঠ করিবার পর তাঁহার সৃষ্ট দেবচরিত্র সম্বন্ধে পাঠকগণকে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। মাইকেল মহেশ্বরীর চরিত্র কিরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে এইরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন ঃ

"ইন্দ্রের অনুরোধে পার্ব্বতী শিবের নিকট গমনোদ্যত হইলেন। রতিকে আহ্বান করিতেই রতি উপস্থিত হইলেন এবং রতির পরামর্শে মোহিনী মূর্ত্তি ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্গা মদনকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেন,

"চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যেথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা ; চল ত্বরা করি।"

"বাছা" কহিলেন—

"কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্রনন্দিনী,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী বেশে,
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত হেরিলে,
ওরূপ মাধুরী সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবী, সত্বরে ঘটিবে।

সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেবসহ সুধা-মধু হেতু।
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি,
ছদ্মবেশী হৃষিকেশ ত্রিভুবন হেরি,
হারাইল জ্ঞান সবে এ দাসের শরে।
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব দৈত্য ; নাগদল নম্র শির ; লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি,
অচল হৈল হেরি উচ্চ কুচযুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে,
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর?"

'বাছা'র সহিত 'মাতা'র কি চমৎকার মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়াছেন? মলম্বা অম্বরের (গিল্‌টি) উদাহরণ দিয়া মদন কথাটি আরো কেমন রসময় করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়াছেন?"

কালিদাস সংযমী মহেশ্বরের চিত্রে মহেশ্বরের যে কঠোর আত্মসংযম প্রকাশ করিয়াছেন, যোগীন্দ্রনাথ বলেন, "মধুসূদনের হরধ্যানভঙ্গে তাহার কিছুই নাই।

কামদেবের অস্ত্রাঘাত মাত্র তাঁহার (মুহূর্ত্তপূর্ব্বে "বাহ্য-জ্ঞান হত" "তপঃসাগরে নিমগ্ন") মহাদেব অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং ভগবতীর মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিলাসলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই চিত্রে মধুসূদন কেবলই সংযমী মহাদেবের চরিত্রের মহত্ত্ব নষ্ট করেন নাই, ভগবতীরও চরিত্রের হীনতাসাধন করিয়াছেন। মহাদেবের তপোবিঘ্ন সম্বন্ধে কুমারসম্ভবের পার্ব্বতী সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তিনি পবিত্রচিত্তে, মহাদেবের পূজার জন্য তাঁহার তপোবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য কামদেব দেবকার্য্য উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, মহাদেবের তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীর তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও অপরাধ ছিল না। কিন্তু মেঘনাদবধের পার্ব্বতী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও জঘন্য উপায়ে স্বামীর ধ্যানভঙ্গ করিয়াছেন। যিনি স্বয়ং তপশ্চারিণীগণের অগ্রগণ্যা এবং জগতে সহধর্ম্মিণী নামের আদর্শস্বরূপা তাঁহার চরিত্র এরূপভাবে চিত্রিত করা মধুসূদনের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।"

বিজাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত, বিকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদনের পক্ষে ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত করা

বরঞ্চ সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু অক্ষয়-চন্দ্রের দেবতাগণের চরিত্র যদি মাইকেলের আদর্শানুযায়ী হয় তাহা হইলে বৃত্রসংহার সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের মূল্য কত তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে।

সর্ব্বাপেক্ষা সুচিত্রিত ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার চরিত্র মধুসূদন সর্ব্বত্র যথেচ্ছরূপে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার স্থান নাই। রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা হইতে অংশ বিশেষ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করিব।

"যখন মেঘনাদ রথে উঠিতেছেন তখন প্রমীলা আসিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,

"কোথায় প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করী-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মন না দিয়া মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ! তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?"

"হৃদয় হইতে যে ভাব সহজে উৎসারিত উৎস-ধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বাক্য কৌশল প্রভৃতি থাকে না। প্রমীলার এই রঙ্গরসের কথার মধ্যে গুণপনা আছে, বাক্যচাতুরীও আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নাই।

"প্রমীলা সখীবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন—

"—লঙ্কাপুরে, শুনলো দানবী
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে।
যাইব তাঁহার পাশে, পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে ;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে---যা থাকে কপালে !
দানব কুলসম্ভবা আমরা, দানবী,---
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত শোণিত নদে নতুবা ডুবিতে !
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে ?
চল সবে রাঘবের হেরি বীরপনা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পনখা পিসী
মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে ;" ইত্যাদি

"প্রমীলা লঙ্কায় যাউন্ না কেন, বিকট কটক কাটিয়া রঘুশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করুন না কেন, তাহাতে ত আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সূর্পনখা পিসীর মদন মদের কথা, নয়নের গরল, অধরে মধু লইয়া সখীদের সহিত ইয়ার্কি দেওয়াটা কেন ?

যখন কবি বলিয়াছেন—

"কি কহিলি বাসন্তি ? পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?"

"যখন কবি বলিয়াছেন—

"রোষে লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী প্রমীলা"

তখন আমরা যে প্রমীলার জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তেজোময় গর্ব্বিত মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এই হাস্য পরিহাসের স্রোতে তাহা আমাদের মন হইতে অপসৃত হইয়া যায়। প্রমীলা এই যে চোক্ ঠারিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া ঢল ঢলভাবে রসিকতা করিতেছেন, আমাদের চক্ষে ইহা কোনমতে ভাল লাগে না !"

আমরা বাহুল্য ভয়ে মধুসূদনের চরিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিলাম না। হেমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলি যথোপযুক্তরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে

গেলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়, কারণ হেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যে সামান্য একটি ঘটনা, সামান্য একটি আচরণের দ্বারা সুনিপুণ নাট্যকারের ন্যায়—প্রকৃত শিল্পীর ন্যায়—তাঁহার চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়াছেন। আমরা এই কাব্যের নাটকত্ব সম্বন্ধে পরে কিছু বলিব।

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন—"এই কাব্যে বৃত্রাসুর, রুদ্র-পীড়, ঐন্দ্রিলা, ইন্দুবালা, ইন্দ্র, জয়ন্ত, অনল, বরুণ, শচী, দধীচি মুনি প্রভৃতি অতি সুন্দর ও যথোপযুক্তরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। বৃত্র ও রুদ্রপীড়ের বীরত্ব, ঐন্দ্রিলার গর্ব্ব ও দুরভিলাষ পূরণের বাঞ্ছা, ইন্দুবালার মনের কোমলতা, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সহিষ্ণুতা, অনলদেবের ঔদ্ধত্য, বরুণের গাম্ভীর্য্য, দধীচির লোকহিতার্থ প্রাণ-ত্যাগ, বিশ্বকর্ম্মার বজ্র নির্ম্মাণ—এ সকল ব্যাপার পাঠ-মাত্র চিত্তমধ্যে যেন অঙ্কিত হইয়া যায়। রুদ্রপীড় ও ইন্দুবালা মেঘনাদবধের ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার স্থানীয়। তন্মধ্যে রুদ্রপীড় কিয়ৎপরিমাণে ইন্দ্রজিতের অনুরূপ হই-লেও ইন্দুবালা প্রমীলা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথগ্‌বিধ পদার্থ। ইন্দুবালার পতিপ্রেম, পতিকৃত সামরিক নিষ্ঠুর কার্য্যের চিন্তায় মনের সেই সেই ভাব, পরদুঃখকাতরতা, পতির

নিধন শ্রবণেই মৃত্যু—এ সকল কোমলতা ও মধুরতার একশেষ!”

রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, “মধুসূদন যেরূপ রামলক্ষ্মণাদির চরিত্র বিকৃত করিয়া জাতীয় শ্রদ্ধার পাত্রদিগকে অশ্রদ্ধেয় করিয়াছেন এবং কাব্য-খানি অহিন্দুভাবাপন্ন করিয়াছেন—মঠ বা মন্দিরের ইষ্টক দ্বারা মস্‌জিদ্‌ উত্থিত করিয়াছেন, হেমচন্দ্র সেরূপ করেন নাই; তাঁহার দেবগণ দেবত্ববিহীন হন নাই, অথচ তিনি অসুরগণের প্রতিও কোন তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন নাই; বরং দৈত্যরাজ বৃত্র, রাক্ষসরাজ রাবণ হইতে উচ্চতর কল্পনার পরিচয় দিতেছে।”

দেবাসুর উভয় পক্ষের প্রতি সমান সহানুভূতির উদ্রেক করা সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। সঞ্জীব-চন্দ্র বলেন, যেমন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বক্ষম সেক্সপীয়রের চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশীয় কবি বলিয়াছেন “Stronger Shakespeare felt for men alone”, যেমন উপন্যাস-সম্রাট্‌ স্কটও স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা পুরুষ প্রণয়নে অধিকতর ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, সেইরূপ হেমচন্দ্র স্ত্রী পুরুষ উভয় চরিত্রই তুল্যভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে হেমচন্দ্র নায়িকাগণের চরিত্রই অধিকতর

নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনা হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধার-যোগ্য—

"যে সকল তত্ত্ব কাব্যের বিষয় তাহা মানবচরিত্রে নিহিত ; অতি মানুষ চরিত্রের বিষয় আমরা কিছু জানি না। এই জন্য যেখানে মনুষ্যপ্রণীত কাব্যে দেবগণের অবতারণ দেখা যায়, সেইখানেই দেবগণ মনুষ্যকল্প ;—মানুষের ছাঁচে ঢালা। মহাভারতে, পুরাণে, ইলিয়দে, পারাডাইজ লষ্টে সর্ব্বত্রই দেবগণ হৃদয়ে মনুষ্যোপম, মানুষিক রাগ, দ্বেষ, দয়া ধর্ম্মে পরিপূর্ণ। হেমবাবুর সুরাসুর সুরী অসুরীগণ ভিতরে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য। বাহ্যচিত্র মনুষ্যালোকাতীত, আভ্যন্তরিক চিত্র মানবানুকারী। তাঁহার সুরাসুরগণ অতিপ্রাকৃত শারীরিক শক্তিবিশিষ্ট মনুষ্য মাত্র।

"সমুদায় নায়ক নায়িকার মধ্যে শচীর চরিত্রই মনুষ্য-চরিত্র হইতে কিছু দূরতাপ্রাপ্ত—এই খানেই দৈবচরিত্রের অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ লক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই শচীচরিত্রের অনবনত এবং অনবনমনীয় মহিমা সমালোচিত করিয়াছি। শচী মানুষীর ন্যায় পুত্রবৎসলা—মানুষীর ন্যায় দুঃখবিদগ্ধা, স্মৃতিপীড়িতা—

অবনীর কঠিন মাটী তাঁহার পায়ে ফুটে, ইন্দ্রের সহিত মেঘবিহারের স্মৃতি নৈমিষারণ্যে তাঁহার মর্ম্মদাহ করে—তথাপি শচী বিপদে অজেয়া, ভয়ে অসঙ্কুচিতা, আপনার চিত্তগৌরবে দৃঢ়সংস্থাপিতা, স্থৈর্য্যে এবং গাম্ভীর্য্যে মহিমাময়ী। সকল নায়ক নায়িকাদিগের মধ্যে শচীর চরিত্রই অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত প্রণীত হইয়াছে। বাঙ্গালাসাহিত্যে এরূপ উন্নত স্ত্রীচরিত্র কোথাও নাই। মেঘনাদবধের প্রমীলা ইহার সহিত ক্ষণমাত্র তুলনীয়া নহে। শচীর পার্শ্বে ইন্দুবালা দেবদারু তলায় নব মল্লিকার ন্যায়, সিংহীর অঙ্কলালিত হরিণশিশুর ন্যায় অনির্ব্বচনীয় সুকুমার। শচীর পর ইন্দুবালার চরিত্রই মনোহর। বস্তুতঃ কাব্যমধ্যে, নায়িকাদিগের চরিত্রগুলিই উৎকৃষ্ট এবং অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়-স্থল। শচী ইন্দুবালা, ঐন্দ্রিলা এবং চপলা সকলেই সুচিত্রিত এবং সুপরীক্ষিত।”

নাটকত্ব। বৃত্রসংহার একাধারে কাব্য ও নাটক। বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে যথার্থই বলিয়াছেন, “বৃত্র-সংহারের একটি গুণ এই যে, সেই একখানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে এবং গীতি-কাব্য আছে। হেমচন্দ্র এই কাব্যে প্রথম শ্রেণীর

নাট্যকাব্যের ন্যায় সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের কল্পনা করিয়াছেন। 'আর্য্যদর্শনে'র একজন সুবিজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন, "তাঁহার কল্পনার চমৎকার চিত্র সকল দেখিলে বাস্তবিক তাঁহার কবিত্বশক্তির সমূহ প্রশংসা করিতে হয়। রণজনিতশ্রমে ক্লান্ত জয়ন্ত নিশীথে বনমধ্যে নিদ্রিত আছেন এবং চন্দ্রবিভাও তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্ষণিক নিদ্রা যাইতেছে, ইন্দ্রাণী আসিয়া যখন সেই দৃশ্যের শোভা সম্ভোগ করিতেছেন, সেই একটি সুন্দর ও গভীর দৃশ্য! দানবরমণী ঐন্দ্রিলা যখন নন্দন কাননে বসিয়া আছেন, আর চারিদিকে সুরসুন্দরীগণ তদীয় বিলাস রচনায় নিরত আছে, সেই একটি চমৎকার দৃশ্য। চপলা যখন মদনের সহিত রহস্য করিতেছে, সেই একটি পরম রমণীয় দৃশ্য। ভীষণ যখন চপলার রূপে বিমোহিত হইয়া গেল, সেই একটি চিত্রকরের দৃশ্য। তৎপরে ভীষণ মায়াকাননে ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য যখন বিগলিত-হৃদয় হইয়া গেল, সেই ভাব বর্ণনা দ্বারা কবি কেমন চমৎকার কৌশলে সমস্ত দেবকন্যা অপেক্ষাও ইন্দ্রাণীর রূপের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইন্দ্র যখন কুমেরু গিরি ছাড়িয়া কৈলাসাভিমুখে উঠিতে লাগিলেন, নিম্নে ধরাতল কেমন দেখাইতে

লাগিল, সেও একটি সুমহৎ দৃশ্য কল্পনা। বাস্তবিক এই সমস্ত দৃশ্যই তাঁহার কাব্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই প্রকার কতিপয় পুষ্প তাঁহার রণশোণিতরঞ্জিত ভয়ানক শ্মশানভূমির রচনামধ্যে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে।"

ভাষা ও ভাবের সংযম। কেবল সুন্দর দৃশ্যের কল্পনায় এবং সুন্দর চিত্রগুলি সুন্দরভাবে সংস্থাপনেই কবি কৃতিত্ব প্রদর্শিত করেন নাই, তাঁহার কাব্যের ভাষার আশ্চর্য্য সংযম ও গূঢ় নাটকীয় কৌশল স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিয়াছে। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বৃত্রসংহার কাব্যে ভাষার আশ্চর্য্য সংযম আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, গূঢ় নাটকীয় কৌশলে কবি আমাদিগের নিকট দুই একটি ইঙ্গিতে সৌন্দর্য্যের অবতারণা করেন। বৃত্রের সভায় শচী আনীত হইলেন। তাঁহাকে ঐন্দ্রিলার দাসী করা হইবে। দৈত্যরাজের এই ঘটনায় বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই, কিন্তু শচীকে দেখামাত্র, উগ্রপ্রকৃতি দৈত্যরাজ অনন্যগতি হইয়া—

"চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র, উঠি দাঁড়াইলা।"

"বৃত্র যত বড় অসুরই হউন না কেন, দেবগণের প্রতি তাঁহার যতই ঘৃণা থাকুক না কেন, সৌন্দর্য্য তাহার প্রাপ্য সম্ভ্রম ও পূজা যেন সজোরে আদায় করিয়া লইল। এইরূপ কৌশলপূর্ণ অবস্থার সংস্থান দ্বারা কবি তাঁহার বর্ণনাগুলি সংক্ষিপ্ত ও সার্থক করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকের নিকট স্ত্রীলোকের রূপবর্ণনা যতই দীর্ঘ ও বেসুরা হউক না কেন, কিছুতেই বিরক্তিকর হয় না। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এ বিষয়ে বাঙ্গালীর অসামান্য ধৈর্য্যের অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কবি হেমচন্দ্র অতি অল্প কথায় সৌন্দর্য্যের আভাস দিয়া পাঠকের কল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্বোধিত করিয়া দিয়াছেন। শচীর সৌন্দর্য্যবর্ণনা দুই একটি কথায় শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "ঘোর ক্ষিপ্ত ও উন্মাদ" শচীর মুখ দেখিলে স্তব্ধ হইয়া পড়িত। ধন্য সেই সৌন্দর্য্য, যাহা চৈতন্যহীনের চৈতন্যের উন্মেষ করিতে পারে! যাঁহারা প্রতি ছত্রে ভাবিয়া পড়িবেন, কবি তাঁহাদিগের নিকট বেশী ধরা দিবেন। মেঘনাদবধের শব্দার্থ খুঁজিতে পাঠক কখনও কখনও থামিতে পারেন, কিন্তু বৃত্রসংহারের ভাবার্থ ও কাব্যগত নিপুণতা ভাল-

রূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য পাঠককে অনেকবার থামিতে হইবে। এই ভাষার সংযম ও উচ্ছ্বাস-সম্বরণ-শক্তির জন্য কাব্যখানি একটু কঠোর শ্রী ধারণ করিয়াছে। শচী-পুত্র জয়ন্ত রুদ্রপীড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন; দৈত্যগণ এখনই শচীকে ঐন্দ্রিলার দাসী করিবার জন্য স্বর্গে লইয়া যাইবে; মৃতকল্প পুত্রের মুখ দেখিয়া শচীর মুখ 'বারিভারাক্রান্ত মেঘের' মত হইল, অথচ উদ্যত 'কঠোর অশ্রু নেত্রে' স্খলিত হইল না। তুষারশুভ্র নৈরাশ্যের ন্যায় তিনি সেই স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন, "মলিন প্রস্তর-মূর্ত্তি অর্দ্ধ অচেতন।" অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষমতাপন্ন কবি এই স্থান উপলক্ষ করিয়া বেহদ্দ কান্নার সুরে আমাদিগকে পাগল করিয়া ছাড়িতেন। এই সংযম শক্তিই হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব, এই গুণে তাঁহার চরিত্রগুলি অখণ্ড মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছে। * * * *

"এই কাব্যখানিতে নাটকীয় কৌশল অনেক স্থানে লক্ষিত হইবে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ঐন্দ্রিলা শচীকে দাসী করিবেন, শচী তাঁহার 'বসনভূষাতাম্বুল-বাহিনী' হইবেন, "অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ" —জগৎ-পূজ্যা দেবরাণীর এই অপমানে জগৎ ব্যথিত

হইল। পাপের একটা সীমা আছে, বৃত্র আজ তাহা অতিক্রম করিল। এই ঘটনায় সহসা রুদ্র ভক্তের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার ক্রোধে 'ব্রহ্মাণ্ডের বিম্ব'গুলি ব্যোমপথে মিশিতে লাগিল ও ত্রিলোক কম্পিত হইতে লাগিল। বৃত্রাসুর তাঁহার ভাবী সর্ব্বনাশের পূর্ব্বাভাস বুঝিতে পারিলেন তাহা একটি কথায় কবি গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন,

'নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল।'

পলকহীন চক্ষু অপেক্ষা নির্ভীকত্বের কল্পনা উচ্চ হইতে পারে না। দৈত্যের ভাগ্যবিপর্য্যয় একটি পলক-পাতে সূচিত হইয়াছে, কবি অধিক কথা বলেন নাই।

"দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দৈত্যগণ পরাস্ত হইয়াছে, অসংখ্য দৈত্য-শরে স্বর্গের অঙ্গন আবৃত। এই সময়ে ত্রিলোকভীতিকর শিবের শূল হস্তে বৃত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া শূল নিক্ষেপ করিলেন। নভঃপথে পরিভ্রাম্যমান শূল অলৌকিক জ্বালা ও তেজ বিচ্ছুরিত করিয়া ছুটিল। দেবগণ তিষ্ঠিতে না পারিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তখন

'প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিলা ত্রিশূল
ঘুরি অন্তরীক্ষময় লক্ষ্য না পাইয়া
ফিরিলা দৈত্যেন্দ্র করে।'

এবং সেই ত্রিশূল-আলোকে,—

"'দেখিলা অদূরে হয়ে ধূলি-বিলুণ্ঠিত
দনুজ-বিজয়কেতু, নেহারি দুঃখেতে
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাকা।"

অধ্যায় শেষে এই চিত্রটি একটি সঙ্গিহীন সমুন্নত শৈল-শৃঙ্গের মত বোধ হয়; অথচ উহা কত অল্প কথায় চিত্রিত!

"রুদ্রপীড় বধে উন্মত্ত বৃত্র ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের প্রতি সেই সর্ব্ব-সংহারক ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়াছেন, সমস্ত দেবমণ্ডলী জয়ন্তকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু মহা আশঙ্কায় দেবগণ উৎকণ্ঠিত। এই সময়ে—

'বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমান মার্গে, শূল মধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে।'

"এই আকস্মিক শুভ ঘটনার জন্য পাঠক প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যরূপে মনের উপর ক্রিয়া করে। এই কৌশল হেমচন্দ্র সর্ব্বত্র দেখাইয়াছেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বজ্র গড়িতেছিলেন কিন্তু বজ্র নির্ম্মিত হইলে শিল্পী,

'না পারি ধরিতে ছেড়ে দিল অকস্মাৎ।'
বজ্র কিরূপ ভীষণ তাহা এই একটি কথায় কবি বুঝাই দিলেন।"

সুরুচি ও নৈতিক সাবধানতা। শিক্ষ ও সংসর্গের দোষে মধুসূদন তাঁহার কাবে স্থানে স্থানে কুৎসিৎ রুচির পরিচয় দিয়াছেন পার্ব্বতীর অভিসার বর্ণনা, সূর্পনখার মদনমদের কথ লইয়া প্রমীলার রসিকতা প্রভৃতি কাব্যের কতদূর হীনতা সাধন করিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন। বিনা প্রয়োজনে

ধকধকে রত্নাবলী কুচযুগ মাঝে
পীবর। দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধুকালে

কিম্বা

মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দংশনে,
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে
পরাণ।

ইত্যাদি পদ সন্নিবেশিত করিয়া মাইকেল তাঁহার বীররসপ্রধান কাব্যের কি সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন তাহাও আমাদের বোধগম্য নহে। মাইকেল তাঁহার

চরিত্রেও যেমন সংযমের পরিচয় দেন নাই, তাঁহার কাব্যেও সেইরূপ সংযমের অভাব। যেখানে সতী প্রমীলা চিতারোহণ করিতেছেন, সেখানেও কবির দৃষ্টি সরু কটি ও সুউচ্চ কুচযুগে নিবদ্ধ

"মলিন দোঁহে। সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়া
সে সুউচ্চ কুচযুগে গিরিশৃঙ্গ সম।"

বৃত্রসংহারে হেমচন্দ্র যে সুরুচি ও নৈতিক সাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই কাব্যে প্রেমের বাহুল্য নাই, বাঙ্গালা কাব্যের পক্ষে ইহা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রথম যে অধ্যায়ে ঐন্দ্রিলা ও বৃত্র পাঠক সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন সেখানে প্রেমের সুদীর্ঘ বক্তৃতার পরিবর্ত্তে অসুর-রমণীর বিশাল অভিমানের চিত্র দেখিয়া পাঠক চমৎকৃত হই-হইবেন। শচী অলোকসামান্যা রূপবতী, তাঁহাকে হস্তগত করিয়া অসুরের যে একটা প্রণয়-পিপাসা জাগিয়া উঠে নাই ইহা বড় সৌভাগ্য। শচী দৈত্যদের হস্তে অশেষরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন, কিন্তু যে লাঞ্ছনায় কাব্যের গৌরব বিনষ্ট হইত, তাহা হইতে কবি সাবধানে

শচীকে রক্ষা করিয়াছেন। বৃত্র আসুর তেজ ও আসুর দর্পের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু সে কুনীতিপরায়ণ নহে। এই জন্য অসুর হইলেও বৃত্র কাব্যের নায়কোপযোগী হইয়াছে। প্রেমের অভাবে এই কাব্যে বাঙ্গালী পাঠক একান্ত শূন্যতা অনুভব করিবেন। যেখানে ঐন্দ্রিলা বসনভূষণে সুন্দরী সাজিয়া দৈত্যরাজের মন হরণ করিতে চেষ্টিত, সেখানেও তাঁহার দৃঢ় অভিপ্রায় বিদ্যমান, প্রেমের ছদ্মবেশে আমরা সেখানেও ত্রিভুবনবিজয়িনী আকাঙ্ক্ষার অভিনয় দেখিতে পাই। রুদ্রপীড়পত্নী ইন্দুবালা প্রেমিকা কিন্তু বিশ্বহিত, নির্ভীক সারল্য এবং ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার প্রেমের জীবন, ঔপন্যাসিক প্রেমিকাগণ হইতে তিনি স্বতন্ত্র এবং গৌরবজনক আসনের যোগ্যা। অসুরবালাগণ মৃত স্বামীদিগের শব দেখিয়া যে বিলাপ করিতেছেন, তাহাতেও কবির নৈতিক সাবধানতা দৃষ্ট হইবে। কোন রমণী—"ধীরে তুলি শিশুকর, কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠে সে কোমল করে! হায় কেহবা ধরিছে, পতির অধরদেশে শিশুর অধর।" কিন্তু কোন স্থানেই রমণীগণ নিজেরা অভিনেত্রী সাজেন নাই, শিশুরা শবের কণ্ঠে লগ্ন হইয়া জননীদের মর্ম্মস্পর্শী শোকের অভিনয় করি-

য়াছে। মূল কথা কবি কাব্যের মর্য্যাদা সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন, কোথাও কোন চাপল্য প্রদর্শন করেন নাই। এইরূপ সংযম বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব। কবি দীর্ঘ রূপবর্ণনার বিরোধী কিন্তু সহসা কোন বিশেষ অবস্থার সংস্থানে কাব্যোক্ত কোন চরিত্রের অসাধারণ স্ফূর্ত্তি পাইলে সেই চিত্রের উপর পর্য্যাপ্তরূপ আলোক আসিয়া পড়ে। কবিকে সেই বিশেষ বিশেষ ঘটনায় উচ্ছ্বসিত মূর্ত্তি অবশ্যই আঁকিতে হইবে। ঐন্দ্রিলাকে যেখানে বৃত্র 'বামা তুমি' বলিয়া ঈষৎ অবজ্ঞা দেখাইয়াছিলেন, সেখানে অভিমানিনী পৃষ্ঠ-লম্বিত বেণী দোলাইয়া আহত ভুজঙ্গিনীর মত স্বামীকে অনেক দর্পের কথা কহিয়াছিলেন,সেই স্থানে কবি উপমার উপর উপমা দিয়া ক্রুদ্ধা মানিনীর সেই সময়ের মূর্ত্তিটি আঁকিয়াছেন। যেখানে জয়ন্ত দৈত্যদিগের আস্ফালন শুনিয়া যুদ্ধোদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেখানে কবির আর একটি চিত্রাঙ্কনের সুযোগ হইয়াছে। কি সাগ্রহ প্রতীক্ষায় জয়ন্ত যুদ্ধের রব শুনিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা উপর্য্যুপরি উপমা প্রয়োগে কবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এই কাব্য কখনও যে সাধারণের প্রিয় হইবে, আমাদের সে ভরসা অল্প। ইহাতে পাঠককে সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ দেবলোকে

বিহার করিতে হয়। চিন্তাশীলতার এতটা প্রবর্ত্তনের জন্য পাঠক প্রস্তুত থাকিবেন না। কবি বন্যফুলের মত রাশি রাশি কবিত্বকুসুম কাব্যের পত্রে পত্রে ছড়াইয়া রাখেন নাই, পাঠকের অনায়াসলব্ধ পুরস্কার জুটিবে না। কবি বহুসংখ্যক পুষ্প নিষ্পেষিত করিয়া পুষ্পসার সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন, বহু গ্যালন জল ঘনীভূত করিয়া তুষারের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষার নিবিড়তার জন্য এই কাব্য সাধারণ পাঠকের উপ-যোগী হয় নাই। কিন্তু এই কাব্যের অনন্যসাধারণ সংযম, পৌরুষ এবং গূঢ় নাটকীয় কৌশল বহু সম্মানের যোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্যে ইহার স্থান স্বতন্ত্র, কিন্তু বিশেষ গৌরবান্বিত। সাধারণ পাঠক ইহাকে আদর না করিলেও ইহা স্বীয় অখণ্ড সৌন্দর্য্যদর্পে মৌনভাবে স্বীয় নির্জ্জনস্থানে ভাবুক মণ্ডলীর পূজার প্রতীক্ষা করিবে।”

বর্ণনাশক্তি। মাইকেল তাঁহার কাব্যে অনেক বিষয় যথাযোগ্যরূপে বর্ণিত করিতে পারেন নাই। প্রথমেই রাবণের সভার যে বর্ণনা করিয়াছেন, রবীন্দ্র-নাথ বলেন তাহাতে গাম্ভীর্য্যের একান্ত অভাব, তাহা রাবণের সভা নহে, যেন নাট্যশালার বর্ণনা।

রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর,'

"ভাবিলাম মহাকবি সাগরের কি একটি মহান্ গম্ভীর চিত্রই অঙ্কিত করিবেন, অন্য কোন কবি এ সুবিধা ছাড়িতেন না ; সমুদ্রের গম্ভীর চিত্র দূরে থাক্, কবি কহিলেন—

'বহিছে জলস্রোত কলরবে
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে'

যাঁহাদের কবি আখ্যা দিতে পারি তাঁহাদের মধ্যে কেহই এইরূপ নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিশাল সমুদ্রের ভাব এত ক্ষুদ্র করিয়া ভাবিতে পারেন না।"

মাইকেল কৈলাস শিখরের যে বর্ণনা করিয়াছেন—

'মানস সকাশে শোভে কৈলাস-শিখরী
আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন মাধবের শিরে।
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণ ফুল শ্রেণী
শোভে তাহে আহা মরি পীতধড়া যেন।

নির্ঝর-ঝরিত বারি-রাশি স্থানে স্থানে
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ ।'

রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "যে কৈলাস-শিখরী চূড়ায় বসিয়া মহাদেব ধ্যান করিতেছেন কোথায় তাহা উচ্চ হইতেও উচ্চ হইবে, কোথায় তাহার বর্ণনা শুনিলে আমাদের গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, নেত্র বিস্ফারিত হইবে, না 'শিখিপুচ্ছ-চূড়া যথা মাধবের শিরে।' মাইকেল ভাল এক মাধব শিখিয়াছেন, এক শিখিপুচ্ছ, পীতধড়া, বংশীধ্বনি আর রাধাকৃষ্ণ কাব্যময় ছড়াইয়াছেন। কৈলাস-শিখরের ইহা অপেক্ষা আর নীচ বর্ণনা হইতে পারে না। কোন কবি ইহা অপেক্ষা কৈলাস-শিখরের নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না।"

মাইকেলের এই সকল "টানিয়া বুনিয়া বর্ণনা"রও হাস্যজনক উপমার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমালোচনায় বিস্তারিত ভাবেই দিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে সে সকল পুনঃপ্রদর্শিত করিতে গেলে 'পুঁথি যায় বেড়ে।' হেমচন্দ্রের অপূর্ব্ব বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাঠকগণ অনেক পাইয়াছেন, এস্থলে 'আর্য্যদর্শনে' একজন সুবিজ্ঞ সমালোচকের অভিপ্রায় নিম্নে পুনঃ প্রকটিত করিলেই যথেষ্ট হইবে :—

"হেমচন্দ্রের বর্ণনা তাঁহার কবিতার প্রধান গুণ। তাঁহার কল্পনা যেমন উচ্চ ও গভীর, তাঁহার বর্ণনা তেমনি ধীরে ধীরে উচ্চে উঠিতে ও গভীরতর হইতে থাকে। তাঁহার বর্ণনায় ওজস্বিতা ও জীবিতভাব অনুভূত হয়। তাঁহার চিত্রসকল বর্ণে উচ্ছলিত দেখায়। তিনি ভাব সকলকে একে একে দলে দলে প্রবাহের মত আনিয়া ফেলেন। স্থির হইয়া দেখিতে পারি না, মনে সকল ভাবের অঙ্কপাত হয় না। কিন্তু সমুদায় বর্ণনায় মনে একটি উচ্চভাবের উদ্রেক হয়। মন প্রমত্ত হয় না কিন্তু অধস্তন প্রদেশ হইতে উথলিয়া উঠে। একদা উচ্চে উঠিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। স্বর্গের দিকে নয়ন উন্মীলিত হয়। কবির বর্ণনার প্রভাব মনে উদিত হইতে থাকে।"

নৈতিক সৌন্দর্য্য ও লোকশিক্ষা।

কেহ কেহ বলেন, উত্তম কাব্যের প্রধান লক্ষ্য লোকশিক্ষা, অপর কেহ কেহ বলেন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। 'সৌন্দর্য্য কি?'—তাহা সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিৎ সঞ্জীবচন্দ্র এই রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

"কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। বৃত্রসংহারের উদ্দেশ্যও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। কিন্তু কিসের সৌন্দর্য্য?

কোন্ আকার ধরিয়া সৌন্দর্য্য কাব্যমধ্যে অবতরণ করিবে? যদি কাব্য না হইয়া ভাস্কর্য্য বা চিত্রবিদ্যা হইত, তাহা হইলে সহজেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইত। রতির রূপ বা রুদ্রপীড়ের বল প্রস্তরে খোদিত হইত—নন্দনকাননের শোভা, বা সুমেরুর মাহাত্ম্য পটে বিকসিত হইত। কিন্তু গঠন বা বর্ণের সৌন্দর্য্য মহাকাব্যের উদ্দেশ্য নহে—মনের সৌন্দর্য্য ইহার উদ্দেশ্য। কেবল পর্ব্বতের শোভা, রমণীর রূপ বা আকাশের বর্ণ ইত্যাদির দ্বারা মহাকাব্য গঠিত হইতে পারে না। আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যই এইরূপ কাব্যের উদ্দেশ্য। মানসিক বা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য, কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুতেই প্রকাশিত হয় না। অতএব কার্য্যের বিবৃতি লইয়া এ সকল কাব্য গঠিত করিতে হয়। যে কার্য্য সুন্দর তাহাই কাব্যের বিষয়। কিন্তু কোন্ কার্য্য সুন্দর? ইহার মীমাংসা করিতে গেলে 'সৌন্দর্য্য কি?' তাহার মীমাংসা করিতে হয়। তাহার স্থান নাই—তাহার সময় এ নহে। তবে অনুভব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কোন মহদ্ধর্ম্মের সঙ্গে যে কার্য্য কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহাই সুন্দর। কার্য্যটি নীতিসঙ্গত না হইলেও হইতে

পারে, তথাপি কোন সুপ্রবৃত্তি বা সুনীতির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাহি। সুন্দর কার্য্যই সুনীতিসঙ্গত। অতিভীষণ কার্য্যও এইরূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত হইলে সুন্দর হইয়া উঠে। যখন দেখা যায় যে কেবল ধর্ম্মানুরোধেই পরশু-রাম মাতৃহত্যারূপ মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখন সেই মহাপাপও সুন্দর হইয়া উঠে।

"কার্য্য অনেক সময়েই স্বতঃসুন্দর হয় না। অন্য কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াই সুন্দর হয়। রাম কর্ত্তৃক সীতা ত্যাগ স্বতঃ সুন্দর নহে, অনেক ইতর ব্যক্তি আপনার পরিবারকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু রামসীতার পূর্ব্বপ্রণয়, রামের জন্য সীতা যে দুঃখ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং যে কারণে রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন, এই সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াই সীতাত্যাগ সুন্দর কার্য্য।—'সুন্দর' অর্থে 'ভাল' নহে। অতি মন্দ কার্য্যও সুন্দর হইতে পারে। এই রামকৃত সীতাবর্জ্জন ও পরশুরামকৃত মাতৃবধ ইহার উদাহরণ। কিন্তু ভাল হউক মন্দ হউক, যেখানে সম্বন্ধ বিশেষেই কার্য্যের সৌন্দর্য্য, তখন সে সৌন্দর্য্য ঐ সম্বন্ধের। আরও বিবেচনা করিতে হইবে

যে কার্য্য পরম্পরার যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যে কতক-গুলি নিত্য। যেগুলি নিত্যসম্বন্ধ সেগুলি নিয়ম বলিয়া পরিচিত। ঐ নিয়মগুলিই নৈতিকতত্ত্ব। যদি কার্য্যের পরস্পর সম্বন্ধটি সৌন্দর্য্যের আধার হয়, তবে ঐ নৈতিকতত্ত্বগুলিও সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইতে পারে। বাস্তবিক অনেকগুলি কঠিন ও দুরূহ নৈতিকতত্ত্ব অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ—অপরিমিত মহিমময়। প্রতিভাশালী কবির হৃদয়ে পরিস্ফুট হইলে তাহা কাব্যে পরিণত হয়। নৈতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য; কিন্তু সৌন্দর্য্য নৈতিক তত্ত্বে নিহিত বলিয়া তিনি তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েন।

"মনুষ্যজীবন * সৌন্দর্য্যের উৎস—অতএব মনুষ্য-জীবনই কাব্যের বিষয়। কোটিরূপধারী মনুষ্যজীবন কখন এক কাব্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না—এইজন্য কাব্যমাত্রে মনুষ্যজীবনের এক-একটী অংশ মাত্র ব্যাখ্যাত হয়। রামায়ণে রাজধর্ম্ম, মহাভারতে বিরোধ, ইলিয়দে ক্রোধ এবং মিলটনে অপরাধ। রোমিও

---

* কাব্যের নায়ক মনুষ্যকল্প দেবতা হইলেও এ কথার কোন ব্যত্যয় নাই।

জুলিয়েটে যৌবন, ম্যাক্‌বেথে লোভ, শকুন্তলায় সরলতা উত্তরচরিতে স্মৃতি। সকলগুলিই নৈতিক বা মানসিক তত্ত্ব। তদ্বিরহিত শ্রেষ্ঠ কাব্য নাই।

"হেমবাবু মনুষ্যজীবনের যে মূর্ত্তি লইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা পরম সুন্দর। বাহুবলের শাস্তা ধর্ম্ম; ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাহুবল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অত্যাচার ঈশ্বরের অসহ্য; পুণ্যের সঙ্গে লক্ষ্মীর নিত্য সম্বন্ধ। এ তত্ত্ব সৌন্দর্য্যে পরিপ্লুত; যে প্রকারে ইহাকে স্থাপন কর, যে ভাবে ইহাকে দেখ, আলোকসম্মুখী রত্নের ন্যায় ইহা জ্বলিতে থাকে। হেমবাবু এই তত্ত্বকে এতদূর প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন, যে ইহার দ্বারা অদৃষ্টও খণ্ডিত হইল; ত্রিভুবনজয়ী বৃত্রের আলয়ে রমণীর অপমান দেখিয়া ত্রিদেব—তিনমূর্ত্তিতে পরমেশ্বর—অদৃষ্ট খণ্ডিত করিলেন—অকালে বৃত্রের নিধন হইল।"

বৃত্রসংহার যেমন নৈতিক সৌন্দর্য্য তেমনই শিক্ষায় পরিপূর্ণ। মেঘনাদবধে এ সৌন্দর্য্য—এ শিক্ষা নাই। বৃত্রসংহারের প্রধান শিক্ষা, মাননীয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্য-প্রভা সরকার মহোদয়ার ভাষায়, "পৃথিবীর সকল বল তখনই জয়শালী হয়, যতক্ষণ তাহা ন্যায়, সত্য ও পুণ্যের

উপরে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অধর্ম্ম আসিয়া মিলিত হইলেই, যত বড় শক্তি হউক না কেন,তৎক্ষণাৎ তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সংসারে পুণ্যের জয় হইবে, ইহা যেমন সত্য, অধর্ম্মের ক্ষয় হইবে, ইহাও তেমন অনিবার্য্য।"

হেমচন্দ্রের কাব্যের অদ্ভুত সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র কিন্তু বলেন যে, তাঁহার জ্বালাময়ী কবিতায় "আমরা স্বধর্ম্ম শিক্ষার উপাদান পাই না।" অক্ষয়চন্দ্রের "স্বধর্ম্ম" কি তাহা আমরা বিশেষ অবগত নহি, কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস যে দেবগণের গভীর স্বদেশবাৎসল্যে,ইন্দ্রের কঠোর সাধনায়, দধীচির মহান্ আত্মত্যাগে, শচীর দৃঢ়নিভরতায় ইন্দুবালার অপূর্ব্ব বিশ্বপ্রেমে, সর্ব্বোপরি মহাকাব্যের যে মহতী নৈতিক শিক্ষার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইল তাহাতে, কেবল হিন্দুর নহে, বিশ্বমানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার প্রচুর উপাদান আছে।

মাইকেলের নিকট ঋণ।—বৃত্রসংহারের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে গেলে, একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। বর্ত্তমান প্রস্তাবে উহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার স্থান নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে একটি বিষয়ে কিছু বলা

উচিত। অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে হেমচন্দ্র মাইকেলের অনুকারী, বৃত্রসংহার মেঘনাদ-বধের অনুকরণে রচিত; মেঘনাদবধ না হইলে বৃত্র-সংহার হইত না, মাইকেলের নিকট হেমচন্দ্র অনেক পরিমাণে ঋণী।

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে পাঠকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, দুইটা কাব্যই বীর-রসপ্রধান, এতদ্ব্যতীত উহাদের মধ্যে আর কোন সাদৃশ্যই নাই। ভাষায় ও ছন্দে, চরিত্রচিত্রণে, নাটকত্বে, ঘটনাসংস্থানে, ভাষার ও ভাবের সংযমে, বর্ণনায়, নৈতিক সৌন্দর্য্যে ও শিক্ষায় বৃত্রসংহারের আদর্শ মেঘনাদবধের আদর্শ হইতে পৃথক্‌ এবং অনেক উচ্চ স্থানে সংস্থিত। হেমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি অনেক স্থলে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাব সঙ্কলন করিয়াছেন। যদি তিনি মাইকেলের নিকট কিয়ৎ-পরিমাণেও ঋণী হইতেন, তাহা হইলে, যাঁহারা তাঁহার প্রকৃতি জানেন, তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে হেমচন্দ্র মাইকেলের নিকট ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। আসল কথা এই, মাইকেল স্বয়ং একজন প্রধান অনুকারক, এবং মাইকেল এবং হেম-

চন্দ্রের কাব্যদ্বয়ের কোন স্থানে যদি মিল্টনের প্রভাব সমানভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে একজন অপরের নিকট ঋণী বলা যায় না। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক রাজনারায়ণ বসু একস্থানে যথার্থই বলিয়াছেন, "এসিয়া কিম্বা ইউরোপ খণ্ডের এমন কোন কবি নাই, যাঁহাকে মাইকেল মধুসূদন অনুকরণ করেন নাই। স্বকপোল-রচনা শক্তি বিষয়ে, মোটা ধুতি ও দোজা পরিধানকারী দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শোভন ধুতি ও উড়ানী পরিধান-কারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ্ ভারতচন্দ্র এবং কোট পেণ্টুলান পরিধানকারী মাইকেল মধুসূদনকে জিতিয়াছেন সন্দেহ নাই।" মাইকেলের নিরপেক্ষ চরিতকার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় কোন্ কোন্ চরিত্র বা দৃশ্য কোন্ কোন্ পাশ্চাত্য কাব্য হইতে অন্ধভাবে অনুকৃত এবং সেই অন্ধ অনুকরণের জন্য স্থানে স্থানে তাঁহার কাব্যের কিরূপ অপকর্ষ ঘটিয়াছে তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। পাঠকগণ জানেন যে মিল্‌টনের Paradise Lost এর প্রথম ছয় সর্গ হেমচন্দ্রের B. A. পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক ছিল। মিল্‌টনের "ভাবের গভীরতা, শব্দবিন্যাসের রাজগাম্ভীর্য্য ও রচনার জমজমাট" তরুণ বয়স হইতেই

যে তাঁহার মনে প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিল ইহা অস্বাভাবিক নহে।

'মেঘনাদবধ' 'বৃত্রসংহারে'র পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, সেই জন্যই কেহ কেহ মনে করেন বৃত্রসংহারের কবি মাইকেলের নিকট ঋণী। অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের নিকট পরবর্ত্তী লেখকগণের কোন কোন বিষয়ে ঋণ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কেবলমাত্র এক হিসাবে হেমচন্দ্রকে মাইকেলের নিকট ঋণী বলিতে পারা যায়। যেমন মাইকেলের বিলাসিতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচার, কদাচার ও অসংযতেন্দ্রিয়তা, জাতীয় আদর্শে অবজ্ঞা ও বিজাতীয় আদর্শের অন্ধ অনুকরণ অনেকের চক্ষু ফুটাইয়াছিল এবং তাঁহার জীবনের শোচনীয় পরিণাম অনেককে জীবন গঠনে সহায়তা করিয়াছিল, সেইরূপ, হয়ত, মাইকেলের কাব্যের অনাবশ্যক শব্দাড়ম্বর, অসংযত ভাব ও ভাষা, স্থানে স্থানে কদর্য্য রুচির পরিচয়, জাতীয়তার অভাব, এবং পাশ্চাত্য কবিগণের অন্ধ অনুকরণ, হেমচন্দ্রকে সাবধান ও সতর্ক করিয়াছিল।

বঙ্গসাহিত্যে বৃত্রসংহারের স্থান।—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন একস্থানে বৃত্রসংহার সম্বন্ধে

যথার্থই বলিয়াছেন, "রসের এবং ভাবের উদ্দীপনায়, স্থিরীকরণে যথোপযুক্ত সংযম এবং একাগ্রতা এই কাব্যের সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে। কুত্রাপি কবির চাঞ্চল্য অথবা দুর্ব্বলতার পরিচয় নাই। সর্ব্বদিক বিবেচনা করিলে এই কাব্যকে বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পূর্ণ সুগঠিত এবং সুলিখিত কাব্য বলা যাইতে পারে।" রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র বলেন, "সাধারণ পাঠক মেঘনাদ-বধের ক্ষিপ্র ও মুখর অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুবর্ত্তী হইয়া পক্ষপাতী হইবেন, কিন্তু মনস্বী পাঠক বৃত্র-সংহারের বাক্যপল্লবহীনতার মধ্যে মৌন বাণীর পরম কৃপা অনুভব করিবেন। চরিত্রসমূহের তেজ, গাম্ভীর্য্য, অভিমান এবং কাব্যের বিষয় ও অবস্থার সংস্থান সমস্তই অসাধারণরূপ গৌরবান্বিত। কবি সর্ব্বত্রই আমাদের দৃষ্টি অতি উচ্চ লক্ষ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।" বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রতিভার বরপুত্রগণ, যাঁহারা চিরদিন বাঙ্গালীর মানসরাজ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে প্রভুত্ব করিবেন, তাঁহারা সকলেই বৃত্রসংহারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে একমত,—তাঁহাদের অভিপ্রায় পূর্ব্বেই আমরা প্রকটিত করিয়াছি। আমাদিগের বিশ্বাস, চিন্তাশীল এবং রসজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই বঙ্গের কার্লাইল রায় কালীপ্রসন্ন

ঘোষ বাহাদুরের সহিত অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিবেন যে, "হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার মধুসূদনের মেঘনাদবধ হইতে তুলনায় অনেক উচ্চে অবস্থিত" এবং তাঁহার সহিত সমস্বরে কহিবেন, "বৃত্রসংহার সর্ব্বতোভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর মহাকাব্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন একখানি মহাকাব্য আর কোন দিনও ফুটে নাই, ভবিষ্যতে যে ফুটিবে এমন বেশী আশা নাই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—○*○—

কবিতাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)

গীতিকবিতারচনায় হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব।

হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' প্রথম খণ্ডের কিরূপ সমাদর হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। প্রবীণ কবি ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন, "রবীন্দ্রনাথের কবিতা এক্ষন শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপর যে প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছে, সেকালে হেমচন্দ্রের কবিতাবলী শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও রামগোপাল যে নূতন স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র প্রচারিত করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সমাজ-সংস্কারে যে নূতন আদর্শ আনিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রে দীক্ষিত, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত নব্য-বঙ্গ যাহা চাহিয়াছিল হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে তাহাই পাইয়াছিল। মাইকেলের মেঘনাদবধ তখনও বাঙ্গালীর মুখস্থ হয় নাই যখন হেমচন্দ্রের কবিতাবলী তাঁহাকে সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহা এতদূর আদৃত

হইয়াছিল যে আমরা কোনও নাটক অভিনয়ের পূর্ব্বে প্রায়ই হেমবাবুর কোনও কবিতা আবৃত্তি করিয়া রঙ্গালয়ের দর্শকগণকে শুনাইতাম। কখনও কাহাকেও বিধবা নারী সাজাইয়া আবৃত্তি করিতাম

"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে।"

কখনও বা হেমচন্দ্রের 'ভারত বিলাপ' আবৃত্তি করিয়া বলিতাম

ভয়ে ভয়ে গাহি কি গাহিব আর
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার।"*

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হেমচন্দ্রের গীতিকবিতাগুলি সন্নিবেশিত করিয়া ৺ উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কবিতাবলী প্রথম

* অমৃতবাবু বলেন, "হেমবাবুর কবিতায় আছে 'ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর' কিন্তু আমি উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া গাহিতাম "ভয়ে ভয়ে গাহি ইত্যাদি" কারণ 'লিখি'র সহিত 'শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কারে'র সামঞ্জস্য নাই। হেমচন্দ্রের বৃদ্ধাবস্থায় কাশীতে একবার তাঁহাকে এই পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছিলাম। তিনি শুনিয়া বলেন 'বেশ করিয়াছ। যখন ওসব লিখি তখন কি আমার মাথার ঠিক ছিল?' আমি বলিয়াছিলাম, "আপনার কেন, ওরূপ স্থলে মিণ্টনেরও মাথা ঠিক থাকিত না।"

খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিলে বঙ্গীয় পাঠক-সম্প্রদায় গীতিকবিতার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের পুনরাবির্ভাবের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং অনেকেই তাঁহাকে এই জন্য অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তখন বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে গীতিকবিতার তেমন অভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ছোটখাট কবিদের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিহারীলাল ও ঈশানচন্দ্র তখন গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—এবং নবীনচন্দ্রের প্রতিভা তখন অবিশ্রান্তভাবে গীতিকবিতা উদ্গিরিত করিতেছিল। কোন কোনও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের মতে নবীনচন্দ্র অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা 'অবকাশরঞ্জিনী'তে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বাস্তবিক নবীনচন্দ্রের প্রতিভা গীতিকবিতারই বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। তথাপি বাঙ্গালার পাঠক-সম্প্রদায় যে হেমচন্দ্রের গীতিকবিতা পাঠ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, হেমচন্দ্রের গীতিকবিতায় এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল যাহা নবীনচন্দ্রের কবিতায় দুষ্প্রাপ্য ছিল। সে বিশেষত্ব কি, তাহা 'আর্য্যদর্শনে'র একজন সুবিজ্ঞ সমালোচক এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"হেমবাবুর লেখাতে যত তেজ, যত শক্তি, যত গাম্ভীর্য্য আছে, তাহা নবীনবাবুর কবিতাতে দৃষ্ট হয় না। নবীনবাবুর কবিতা মিষ্ট এবং কোমল, হেমবাবুর কবিতা গম্ভীর এবং তেজস্বী। নবীনবাবুর কবিতা সরি মিঞার টপ্পা, হেমবাবুর কবিতা তানসেনের গান। নবীনবাবুর কবিতা কোকিলকণ্ঠী সুন্দরীর কাওয়ালী গীতের ন্যায়—সে যেমন অল্প অল্প নাচিয়া নাচিয়া সৌন্দর্য্যের লহরী তুলিয়া দিয়া তাহাতে সঙ্গীতের লহরী মিশাইয়া দেয়, তেমনি নবীনবাবুর সুন্দর সরল শব্দগুলি নাচিয়া নাচিয়া চারুচিন্তা-তরঙ্গের সহিত মিলাইয়া যায়। নবীনবাবুর কবিতার এতদূর প্রশংসা করিয়া হেমবাবুর কবিতার সম্যক্ বর্ণনা করা দুরূহ বোধ হইতেছে। হেমবাবুর কবিতার সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ইহাতে এমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আছে, হৃদয়কে নাচাইবার, শোণিতকে উত্তপ্ত করিবার, এমন এক অদ্ভুত শক্তি আছে, যে যিনি তাঁহার কবিতা পাঠ করেন নাই, তাঁহাকে তাহা বর্ণনা দ্বারা অনুভব করাইয়া দেওয়া নিতান্ত দুরূহ। ইহা সময়ে সময়ে অতুলনীয়, অমানুষিক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। ইহা মধুর গম্ভীর দেবকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতের ন্যায়। নবীনবাবুর কবিতা

ললিত রাগিণী, হেমবাবুর কবিতা ভৈরব রাগ। নবীনবাবুর কবিতা কুসুম সুরভি বসন্তানিলের ন্যায়, হেমবাবুর কবিতা নিদাঘকালীন কাদম্বিনীনির্ঘোষবৎ ভীম প্রভঞ্জনের ন্যায়। নবীনবাবুর কবিতা, ভাগীরথীর কুলকুলধ্বনি, হেমবাবুর কবিতা দিগন্তবিসর্পী অতলস্পর্শী জলধিকল্লোল। নবীনবাবু মানবহৃদয়ের কেবলমাত্র কোমল ভাব সুচারুরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। হেমবাবু সমগ্র মানবহৃদয় মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আলোচনা ও অধিকার করিয়াছেন।

"হেমবাবুর কল্পনা-বিহঙ্গ যত উচ্চে ছুটিয়া যায় নবীনবাবুর কল্পনা কদাচ তত উচ্চে উঠে না। হেমবাবু যেন

তুচ্ছ করি মর্ত্ত্যভূমি
জ্বলন্ত অনল প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অনিল-পথে সুস্বর ছড়ান।

নবীনবাবুর কল্পনা প্রণয়-ঘটিত বা তৎসদৃশ অন্য কোন কোমল বিষয় লইয়া কাল অতিবাহিত করিতে বিলাস করে। হেমবাবুর কল্পনা সৃষ্টি প্রলয় ইত্যাদি ঘোর গভীর বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে ভালবাসে।

তবে যে হেমবাবু কোমল বিষয়িণী গীতি গাইতে পারেন না তাহা নহে। হেমবাবু ইচ্ছা করিলে যে নবীনবাবুর ন্যায় মৃদুকোমলস্বরে গাইতে পারেন না তাহা নহে—যেহেতু 'হতাশের আক্ষেপ' ও 'প্রিয়তমার প্রতি' তাহার প্রমাণ। হেমবাবু বসন্ত সমীরণ বহাইতে পারেন, প্রসূননিচয়শোভিত বল্লরীকে দোলাইতে পারেন, কল্লোলিনীর কুলুকুলু রব, গোকুল নিকুঞ্জে রাধিকার মনের মুরলিধ্বনি সকলই শুনাইতে পারেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছেন যে তাঁহার জন্ম উচ্চ মহান্ সঙ্গীত গাইবার নিমিত্ত। সংক্ষেপে, নবীনবাবুতে যাহা আছে, তাহা হেমবাবুতে আছে; কিন্তু হেমবাবুতে যাহা আছে, তাহা নবীনবাবুতে আছে ইহার প্রমাণ নবীনবাবু কুত্রাপি অদ্যাপি দিতে পারেন নাই।

*　　*　　*　　*

"হেমবাবুর রুচি ও নীতি অতি উচ্চ ও অতি বিশুদ্ধ। পাপের প্রতি বিদ্বেষ, অত্যাচারের প্রতি ক্রোধ, সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা, দুঃখীর প্রতি দয়া, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা, পবিত্রতার প্রতি ভক্তির সঞ্চার, হেমচন্দ্রের কবিতাপাঠে পাঠক উপলব্ধি করিবেন। হেমবাবুর কবিতা, কখন বা বোধ হয়

ধর্ম্মমন্দিরে বেদী হইতে পঠিত হইবার নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে—কখন বা বোধ হয় নির্ব্বাসিত ম্যাটসিনির জ্বলন্ত হৃদয়ভেদী রচনাবলীর ন্যায় ভূতগৌরববিস্মৃত সুষুপ্ত অধীন জাতিদিগকে জাগরিত করিবার জন্য রচিত হইয়াছে।

"ইন্দ্রিয়াসক্তি—পাশব পিপাসা—যাহা নবীনবাবুর প্রণয় কবিতাতে গাঢ়ভাবে সংস্থিত তাহা হেমবাবুর কবিতাতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। হেমবাবু কদাচিৎ যখনই দূষিত ইন্দ্রিয়সুখের উল্লেখ করিয়াছেন তখনই তাহার প্রতি পাঠকের ঘৃণা জন্মাইয়া দিয়াছেন।

* * * *

"সামাজিক দোষোদ্ঘোষণ, মহাত্মগণের গুণ কীর্ত্তন, উৎসবগীতি ও বীর গান প্রভৃতি লৌকিক গীতির প্রবর্ত্তক হেমচন্দ্র। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে উদিত হইয়া যে অমৃতময় মৃতসঞ্জীবনী গীতাবলী বর্ষণ করিয়াছেন, তেমন গম্ভীর, তেমন তেজোময় স্বরলহরী কেহ কখনও শুনে নাই। বাঙ্গালায় সেই গীত অভূতপূর্ব্ব—অননুভূতপূর্ব্ব। হেমচন্দ্র বাঙ্গালায় ধ্রুপদ আরোপ করিলেন—সমস্ত বাঙ্গালা স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইল—কিয়ৎক্ষণের জন্য বাঙ্গালীর মৃতদেহে শোণিত সঞ্চার

হইল—কিয়ৎকালের জন্য বাঙ্গালীর শীতল হৃদয়ও উষ্ণ হইয়া উঠিল। গাও হেমচন্দ্র গাও—তোমার গান সূর্য্যালোকসম প্রচণ্ড অথচ স্বাস্থ্যকর ও মহাফলোৎপাদক।"

"অকাল-কোকিল।" পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে নূতন গীতি-কবিতা-রচনার জন্য হেমচন্দ্রকে অনেকেই অনুরোধ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর সুকবি ঈশানচন্দ্রও "অকাল-কোকিল" শীর্ষক একটি সুন্দর কবিতায় হেমচন্দ্রকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে ঈশানচন্দ্র উক্ত কবিতাটি প্রকাশিত করিবার জন্য প্রেরণ করিলে তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ ২০শে জুলাই তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "অকাল-কোকিলের মত আরও দুটি কবিতা আমি উপহার পাইয়াছি। তন্মধ্যে একটি জঘন্য আর একটি উৎকৃষ্ট, কিন্তু আপনার অকাল কোকিলের নিকট হীনপ্রভ হইবে।" পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে মধুসূদনের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে রচিত কবিতায় হেমচন্দ্রই মধুসূদনকে "অকাল-কোকিল" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আখ্যা হেমচন্দ্রের নিজের উপরই

বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ স্বাধীনদেশে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতিভা যেরূপ স্ফূর্ত্তি পাইত, তিনি যে কালে যে দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা তেমন স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। "ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার"—তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের বাণী সত্য সত্যই অকথিত রহিয়া গিয়াছে। ঈশানচন্দ্রের "অকাল-কোকিল" শীর্ষক কবিতাটি পরে তদ্বিরচিত "চিত্ত-মুকুর"* নামক কাব্য-গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরা সেই কবিতাটির প্রথম ও শেষ শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিতেছি।

কে বলে নাহিক আর বঙ্গের ভবনে
মধুর নিনাদী পিক, নীরব সে ধ্বনি
কাঁদাইয়া গৌড়জনে শ্রীমধুসূদনে
হরিল ভুবনত্রাস শমন যখনি।
নগরের প্রান্তভাগে উন্নত বদনে
অই যে উল্লাসে পিক মধুর ঝঙ্কারে,

* "চিত্তমুকুর" হেমচন্দ্রকেই উৎসৃষ্ট হয়। আমরা উৎসর্গ পত্রটি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

'পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজ মহাশয়।

আর্য্য। সংসারে যদি কাহাকেও দেবতুল্য ভাবিয়া থাকি

'ভারতসঙ্গীত' রাগ সুগম্ভীর তানে
'আর ঘুমাওনা' বলি জাগায় সবারে।
* * * *
হৃদয়ের তুষানল নয়নের জলে
নিবায়ে আনন্দ মনে গাহ একবার
দুখী বঙ্গবাসী প্রাণে গীত রস ঢেলে
শুষ্ক হৃদয়েতে কর সুধার সঞ্চার।
বন্দী যথা রুদ্ধশ্বাসে নির্বান্ধব পুরে
সুদূর কোকিল কণ্ঠে জুড়ায় যাতনা
তেমতি এ বঙ্গবাসী তব সুধাস্বরে
ভুলিবে ঈষৎভাবে দাসত্ব যাতনা।

"তুষানল।" "অকাল-কোকিল"শীর্ষক কবিতা-টির অষ্টম বা শেষ শ্লোকের প্রথম পদদ্বয়ে হেমচন্দ্রের "তুষানল"-শীর্ষক একটি কবিতার প্রতি ইঙ্গিত আছে।

তবে সে আপনি—যদি সদ্গুণের পক্ষপাতী হইয়া কাহাকেও অবনত হৃদয়ে পূজা করিতে ইচ্ছা থাকে সেও আপনি—উন্নত প্রকৃতি দেখিয়া যদি কাহারো পদাবনত হইতে ইচ্ছা হইয়া থাকে সেও আপনি। প্রথমত, অগ্রজ বলিয়া চিত্তমুকুর আপনারই অর্চ্চনার উপকরণ; দ্বিতীয়ত, যে মহাত্মা এত সদ্গুণ বিভূষিত তিনিও উপাস্য। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে চিত্তমুকুর আপনাকেই অর্পণ করিলাম, কনিষ্ঠ বলিয়া আমার প্রতি যেরূপ স্নেহদৃষ্টি আছে চিত্তমুকুরের প্রতি সেই স্নেহদৃষ্টি থাকিলে আর একটি নূতন সুখে সুখী হইব। আপনার স্নেহের শ্রীঃ—

আমরা এ পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে কিছু বলি নাই। অকাল-কোকিল শীর্ষক কবিতাটি রচিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে এবং বোধ হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের প্রথম খণ্ড কবিতাবলীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরেই, হেমচন্দ্র এই কবিতাটি রচনা করেন। 'তুষানল' ও 'ভারত-সঙ্গীত' একত্র মুদ্রিত করিয়া কোন কোন বন্ধুকে তিনি উপহার দিয়াছিলেন এবং তৃতীয় সংস্করণের কয়েকখণ্ড পুস্তকের শেষভাগে উহা বাঁধানও হইয়াছিল। কিন্তু 'তুষানল' কবিতাটি হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাতে 'ভারত-সঙ্গীতে'র কবির হৃদয়ে কি তুষানল অনুক্ষণ জ্বলিতেছিল তাহার আভাস পাওয়া যায়।

'কবিতাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড। বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজের অনুরোধের ফলে বৃত্রসংহারের মহাকবি পুনরায় গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই 'কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড' প্রকাশিত হইল। ইহার প্রকাশ কালে কলিকাতা গেজেটে নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়।

পুস্তকের নাম,—কবিতাবলী বা A collection of poetical pieces দ্বিতীয় খণ্ড। কলিকাতা ৩৫ বেনিয়াটোলা লেন, রায়

যন্ত্রে বিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৪ কলেজ স্কোয়ার রায় প্রেস ডিপজিটারিতে প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ১লা জানুয়ারী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ। পত্র সংখ্যা ৭৭ ডুয়োডেসিমো। প্রথম সংস্করণ ১০০০ ছাপা হইল। মূল্য ॥০। গ্রন্থ সত্ত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর। Descriptive and lyrical poems, Benares and its traditions, the river Ganges, the War in Afghanistan, and the new destiny created by England for the people of this country, are among the subjects.

পুস্তকখানিতে হেমচন্দ্রের নিম্নলিখিত নূতন কবিতাগুলি প্রকাশিত হয় :—

১। কাশী-দৃশ্য ২। শিশুর হাসি ৩। গঙ্গার মূর্ত্তি ৪। চিন্তা ৫। গঙ্গা ৬। বিন্ধ্যগিরি ৭। মণিকর্ণিকা ৮। ইউরোপ এবং আসিয়া ৯। পদ্মফুল ১০। রেলগাড়ী ১১। বিশ্বেশ্বরের আরতি ১২। বাঙ্গালীর মেয়ে।

আমরা পূর্ব্বাবলম্বিত প্রথানুসারে এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

১। কাশী-দৃশ্য। হিন্দুর নিকট কাশীর ন্যায় পবিত্র তীর্থ ত্রিজগতে নাই। সেই সোণার কাশীর

পবিত্র দৃশ্য জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের অমর তুলিকায় উপযুক্ত রূপেই অঙ্কিত হইয়াছে :—

"অই দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে—
বিশাল সলিল রাশি
সম্মুখে চলেছে ভাসি,—
জাহ্নবী কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে !"

এই কবিতাটির শেষভাগে কবি বলিতেছেন,—

"হিমাদ্রি ভূধর হ'তে কুমারিকা ভিতরে
নাহিক এমন প্রাণী,
হেন জাতি নাহি জানি,
কি বাণিজ্য ব্যবসার
ভক্তি মুক্তি কি বিদ্যার
আশা করে যে না আসে অন্নপূর্ণা-নগরে।

আমিও ভিখারী এই ভবরাজ্য ভিতরে,
কে দিবে আমারে ভিক্ষা—
পাব কি আমার দীক্ষা
প্রবেশিলে অই পুরে অর্দ্ধদগ্ধ অন্তরে ?"

উপরি-উদ্ধৃত কয়েকটি সরল ছত্রে কবির যে আন্তরিকতা ও স্বধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রকটিত হইয়াছে তাহা কি গভীর ! সংসার-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত কোন্ দগ্ধহৃদয়

হিন্দুর প্রাণের অন্তরতম তন্ত্রীতে হেমচন্দ্রের ভাবের ঝঙ্কার প্রতিধ্বনি তুলিবে না? কিন্তু হেমচন্দ্রের কাব্যের অদ্ভুত সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র অপূর্ব্ব মনীষাবলে উহা হইতে এক "বিচিত্রা শিক্ষা" আহরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, উক্ত ছত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, "ভক্তি-শূন্য, বিশ্বাস-শূন্য, ছন্ন-হৃদয়ে হেমচন্দ্রের শান্তিলাভ হয় নাই! হেমচন্দ্রের কবিত্ব ও জীবনী হইতে এই বিচিত্রা শিক্ষা আমরা যেন কখনও বিস্মৃত না হই।" কেন শান্তিলাভ হয় নাই তাহার অন্য কারণও অক্ষয়চন্দ্র দিব্যচক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন "কোনরূপ বৈর-ভাব হৃদয়ে পুষিয়া রাখিলে, সে হৃদয়ে আর শান্তি আসে না।" হেমচন্দ্রের ইংরাজ-জাতির উপর তীব্র বৈরভাব ছিল সুতরাং তিনি শান্তি পান নাই। বৈরভাব হৃদয়ে পোষণ করিলে যে শান্তি পাওয়া যায় না—এই মহাসত্য অক্ষয়চন্দ্র নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। ইংরাজ জাতির উপর হেমচন্দ্রের কতদূর বৈরভাব ছিল তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। অপরের ঈশ্বর-ভক্তি বা ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কোন কথা বলা অক্ষয়চন্দ্রের পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে বলিতে পারি না—তবে

অনুসন্ধানে যতদূর জানা যায়, তাহাতে ইহাই অবগত হইয়াছি যে হেমচন্দ্র ভণ্ড ছিলেন না, এবং তাঁহার কাব্যাদির বহুস্থলে যে স্বধর্ম্ম-প্রেম ও ভগদ্ভক্তি প্রকটিত হইয়াছে, তাহা ভক্তিশূন্য, বিশ্বাস-শূন্য হৃদয় হইতে উৎসারিত হয় নাই।

২। শিশুর হাসি। এই কবিতাটিতে শিশু-প্রেমিক কবি "স্বরগের উষা"—শিশুর হাসিটি—অমর করিয়া রাখিয়াছেন,—

"ভাস্‌রে চাঁদের কর—হাস্‌রে প্রভাত,
ডাক্‌ পাখী প্রিয় স্বরে
দোল্‌ পাতা ঝুরে ঝুরে
পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাত ;
উঠুক মানব-কণ্ঠে ললিত সঙ্গীত,
বাজুক্‌ "অর্গান" বাঁশী,
তরল তালের রাশি
ছুটুক নর্ত্তকী-পায় করিয়া মোহিত ;—
কিছুই কিছুই নয়
ও হাসির তুলনায়,
জগতে কিছুই নাই উহার মতন !"

৩। গঙ্গার মূর্ত্তি। "রামনগরে কাশী-রাজের ভবনে শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত একটি সুন্দর গঙ্গার মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।" তদ্দর্শনে এই কবিতাটি রচিত হয়। কবি এই অচেতন পাষাণ-মূর্ত্তিতেও জীবন দেখিতে পাইয়াছেন—

"মৃত যদি তুমি তবে কেন এত
ও মুখ মণ্ডলে লাবণ্যমাখা—
এখনও যেন সে জীবন চন্দ্রমা
সর্ব্ব অঙ্গথরে করেছে রাকা।"

তাই মানব-প্রেমিক কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

"মানবের ব্যথা ব্যথে কি ও হৃদি?—
তবে কেন এত প্রশান্ত মুখ?
দেবের পরাণে পশে কি কখনও
কলুষে তাপিত মানব-দুখ?

৪। চিন্তা। চিন্তাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন,—

কোথা হ'তে এসো, বল ফিরে কোথা যাও?
মানব-হৃদয়ে তুমি কতই খেলাও?
খেলায় দামিনীলতা আকাশে যেমন—

চকিত মেঘের কোলে
চিকণ বরণে দোলে
মানবের হৃদিতলে তুমিও তেমন !

তিনি চিন্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

হে চিন্তা তরঙ্গবতী
মানবের দুঃখ গতি
ফেরে না কি, ফিরাইলে নূতন প্রথায় ?

৫। গঙ্গা। এই কবিতাটির ছন্দ যেন গঙ্গার স্রোতের গতিতে চলিয়াছে। যে ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ ভস্মীভূত সগরকুলকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল, কবি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া সেই ভাগীরথীকে নির্জীব বঙ্গদেশকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য শুভ শঙ্খ-ধ্বনি দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন !

পরহিতে ব্রত করি
দ্রব হ'লে দেহ হরি,
বারিরূপে, সুমঙ্গলে,
শিখাইলে ধরাতলে---
শিখাইছ প্রতি পল---
ত্যাগ-শিক্ষা-পুণ্যফল
দয়া করুণার রেখা
তোমার শরীরে লেখা,

পরহিত-চিন্তা-ব্রত
তরঙ্গিণী, তোমাগত
তাই পুণ্যময় ধারা
হে গঙ্গে পাতকহরা
পতিত পাবনী তোমা সবে বলে রঙ্গে !—
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে গঙ্গে।

*   *   *   *   *

উদ্ধার বঙ্গেরে মাতা
শিখাইয়া এই কথা—
ত্যজে স্বার্থ-আরাধনা
সাধুক্ নিজ-সাধনা ;
ত্যজে ফুল তিল ফল,
তুলুক্ তোমার জল
হৃদয়ে রক্ষণ করি
তোমার দীক্ষা-লহরী,
চলুক্ তোমারি গতি—
স্রোতস্বতী—বেগবতী
বঙ্গের চিন্তার ধারা,
ঘুচুক চিত্তের কারা ;
উদ্ধার—উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে !—
কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী গঙ্গে ?'

৬। বিন্ধ্যগিরি।—ভারতবর্ষে ইংরাজ নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন।

সেদিন নাহি এখন
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান-তিমির-নীরে.
ভারত জাগিছে ফিরে,---
*　*　*
উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো-তুফান,
নবরবিচ্ছবি দেখ গগন ধরেছে।

সেই জন্য ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় উৎফুল্ল হইয়া জাতীয় কবি হেমচন্দ্র দেশবাসিগণকে তাঁহার মর্ম্মস্পর্শিনী কবিতায় উদ্দীপিত করিয়া তাহাদিগের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন :—

কে বলেছে এই ভাবে
ভারতের দিন যাবে ?—
'নিশির প্রভাত নাই'
যে বলে সে জানে নাই,
ভারতের ভাবীবেদ পড়েনি কখন,—
জানেনা সে জগতের
কিবা গতি, কিবা ফের,

ফের্ এ ভারতবাসী
জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি,
হাসিবে অপূর্ব্ব হাসি, লভিয়া জীবন---
চলিবে নূতন পথে
সাধিবে নূতন ব্রতে,
ফিরাতে নারিবে তায়
এ তরঙ্গ নাহি যায়
একবার হৃদিতটে খেলিলে কিরণ,—

যাবে আগে---যাবে সদা,
অন্যথা নহিবে কদা,
চিরদিন এই রীতি,
জীবনের এই নীতি,
জাগিলে নাহিক নিদ্রা—চির জাগরণ।

দিয়াছে সে রশ্মিতেজ
ভারতে আসি ইংরেজ ;
ধরে তার পথ-ছায়া
আবার তোলরে কায়া

* * *

এই সে জীবনারম্ভ,
উদয়ের মূলস্তম্ভ—
কত না জ্বলিতে হবে,

কত না ভাবিতে হবে,
সে জ্বালা—সে বেগ—কেবা জানিবে এখন !
ভুলিতে হ'বে আপন,
ভুলিতে হ'বে স্বপন,
জাগাতে হ'বে জীবন,
তবে সে পারিবে ;
ছুটিতে ওদের সঙ্গে,
লিখিতে কালের অঙ্গে,
খেলাইতে এ তরঙ্গে
তবে সে পারিবে
জ্ঞানের শকতি লভে
জগতে যুঝিতে হ'বে,
তবে সে আসন পাবে,
সঙ্কল্প সাধিবে !
জেনো সত্য—জেনো কথা
ইংরাজ-শিক্ষিত প্রথা
ভারত-উদ্ধার-পথ
ত্যজ অন্য মনোরথ—
ভুলে যাও আগেকার পুরাণ কথন !
না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ,
কে দেখাত, কে শিখাত,

কেবা পথে লয়ে যেত—
যে পথ অনেকদিন করেছ বর্জ্জন।
মুখে বল জয় জয়
ধর ধ্বজা শিলালয়,
ছিঁড়ে ফেল পূর্ব্ববেদ,
ভোলো সে প্রাচীন ভেদ—
অই---ভারতের গতি—রেখো রে স্মরণ
হে ভারত-ব্যাপী গিরি রেখো রে স্মরণ।
ভবিষ্যৎ-পারাবার
পার হতে অন্য আর
ভারতের নাহি ভেলা,
ভারত জীবন খেলা
একত্রে ওদেরি সঙ্গে—উদ্ধার, পতন!

অক্ষয়চন্দ্র বলেন "হেমচন্দ্রের কাব্যে স্বজাতি বাৎসল নাই বলিলেও চলে।" তিনি বলেন হেমচন্দ্র "কোথাও স্মরণশক্তি গুণে স্বদেশানুরাগী, কোথাও জাতিবৈরবলে স্বজাতিবৎসল।" তাঁহার মতে "স্বজাতি প্রেমে হেমবাবু পৌঁছিতে পারেন নাই, বিজাতি-বৈর পর্যান্ত তাঁহার কবিত্বের সীমা।"

অক্ষয়চন্দ্রের এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়াগুলির জন্য

"হেমচন্দ্রস্মৃতিরক্ষাসমিতি" কর্ত্তৃক তিনি পুরস্কৃত হইয়াছেন। এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ এই আবিষ্ক্রিয়াগুলি বহু অর্থব্যয়ে প্রচার করিতেছেন। হেমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি এই অপূর্ব্ব সম্মান বঙ্গদেশে ভিন্ন আর কোথাও সম্ভবে কি?

হেমচন্দ্রের যে দেশভক্তি আদৌ নাই, অক্ষয়চন্দ্র অনুগ্রহ করিয়া ততদূর বলেন নাই। তিনি বলেন, হেমচন্দ্র "জাতিবৈরজনিত দেশভক্তিতে ভোরপূর।" জাতিবৈর অর্থে ইংরাজ জাতির সহিত বৈরতা। হেমচন্দ্রের "এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে" ইত্যাদি পদে জাতিবৎসলতা আছে বটে, কিন্তু, অক্ষয়চন্দ্রের মতে, সর্ব্বত্রই জাতিবৈর আছে। ঈশ্বর গুপ্তের

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

প্রভৃতি পদে যে তীব্র ও বিশুদ্ধ স্বজাতিপ্রেম ও দেশবাৎসল্য আছে, হেমচন্দ্রে তাহা নাই।

সাহিত্য-পরিষদের ছাপ সত্ত্বেও অক্ষয়চন্দ্রের উপরি উদ্ধৃত অভিমতগুলির প্রতিবাদ করা আমরা অনাবশ্যক মনে করি। বিন্ধ্যগিরির যে অংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত

করিয়াছি, তাহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে, ইংরাজ জাতির প্রতি হেমচন্দ্রের কতদূর শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধার পরিচয় তাঁহার রচনার নানাস্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধারণতঃ একটা জাতির প্রতি বৈরভাব পোষণ করা কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অস্বাভাবিক। যদি একজন ইংরাজ অত্যাচার করেন, তবে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি উন্মত্ত না হইলে সমগ্র ইংরাজ জাতির প্রতি বৈরভাব পোষণ করিতে পারেন না। ঈশ্বরগুপ্তের স্বজাতি-প্রেম হইতে হয়ত হেমচন্দ্রের স্বজাতিপ্রেম বিভিন্ন—কিন্তু কাহার প্রেম গভীরতর তাহা বিচার করা সহজ নহে। ঈশ্বর গুপ্ত বলেন, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিব। আমাদের মনে হয়, ইহাতেই জাতিবৈর অধিক পরিমাণে পরিদৃশ্যমান। বিজাতির ঠাকুর বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিব, স্বদেশের নিকৃষ্টতম জীবকেও স্নেহ করিব—ইহাতে যত স্বদেশপ্রেম প্রকাশিত হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে বিজাতি-বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষিত হেমচন্দ্রের পক্ষে এরূপ জাতিবৈর পোষণ করা অসম্ভব। সেই জন্যই বিদেশের "ঋষিতুল্য নর" রিপণের গুণকীর্ত্তনে হেমচন্দ্র আত্মহারা হইয়াছিলেন—বিদেশী

সম্রাজ্ঞীর জুবিলী সঙ্গীতে তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন। বিদেশের ঠাকুর কেবলমাত্র বিদেশের বলিয়া কখনও হেমচন্দ্রের ঘৃণার পাত্র হন নাই। স্বদেশের কুকুরের উন্নতির জন্যও হেমচন্দ্র নিরন্তর যত্নবান ছিলেন, তাহাকে কখনও স্নেহ করিয়াছেন, কখন কখন কশাঘাতও করিয়াছেন, কিন্তু যখন কশাঘাত করিয়াছেন, তখনও তাহার উন্নতির জন্য তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

একটি গল্প মনে পড়িল। শুনিয়াছি, একবার ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কোনও বাটীতে একটি বালকের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। সরকার মহাশয় দেখিলেন যে বালকটি যকৃতরোগে ভুগিতেছে এবং প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তাহার অশিক্ষিতা জননী পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহ বশতঃ দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় পুত্রটিকে শীঘ্র সবল ও স্থূলকায় করিবার মানসে অত্যধিক পরিমাণে ঘৃত ও দুগ্ধ খাওয়াইতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বাটীতে বালকটির সেবা করিবার জন্য আর কেহ আছে কিনা? উত্তর পাইলেন যে বালকটির একটি অপুত্রবতী বিধবা পিসিমাতা আছেন,

তিনি বালকটিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। উত্তর পাইয়া ডাক্তার সরকার ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। বাটীর লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় ব্যবস্থাপত্র দিয়া গেলেন না?" ডাঃ সরকার বলিলেন "ঔষধ দিয়া কি করিব? বালকটিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য একা জননীই যথেষ্ট, তাহার উপর আবার স্নেহময়ী পিসিমাতা আছেন!" এস্থলে জননীর স্নেহের গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু অন্ধ স্নেহ তাঁহাকে পুত্রের শত্রুতে পরিণত করিয়াছে। কোন শিক্ষিতা জননী এরূপ করিতে পারিতেন না। ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম যে গভীর সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু স্বদেশের কুকুরদিগকে মধ্যে মধ্যে কশাঘাত করিয়াছেন এবং বিদেশের মহাত্মগণকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া শিক্ষিত হেমচন্দ্রের স্বদেশবাৎসল্য বা স্বজাতিপ্রেম যে ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম হইতে নিকৃষ্ট এরূপ অনুমান করা একান্ত অনুচিত। স্বদেশে বা বিদেশে যেখানে মহত্ত্ব দেখিয়াছেন, হেমচন্দ্রের হৃদয় সেইখানেই শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে অবনত হইয়াছে, জাতি-বিদ্বেষে কখনও তিনি অন্ধ হন নাই। ইহাতে যদি

তিনি নিন্দনীয় হন, তবে অক্ষয়চন্দ্র তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারেন। মানুষ যেমন জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে, প্রকৃতিও সেইরূপ জাতিভেদ করিয়াছেন। প্রকৃতি দুই প্রধান জাতিতে মনুষ্যদিগকে বিভক্ত করিয়াছেন, মহৎ এবং নীচ। হেমচন্দ্র প্রথম জাতির অন্তর্ভুক্ত —তাঁহার স্বজাতি—মহৎ এবং উদারচরিত ব্যক্তি—জগতের যেখানে থাকুন না, তাঁহার প্রেমের আস্পদ। নীচের প্রতিও তাঁহার অনাদর নাই, কিন্তু স্নেহান্ধ জননীর মত তাহাদের মস্তক ভক্ষণ না করিয়া, শিক্ষিতা জননীর মত তিনি কখনও স্নেহপ্রদর্শন করিয়া, কখনও বা তিরস্কার করিয়া, তাহাকে উন্নতির পথে সমারূঢ় করিবার জন্য নিরন্তর প্রয়াস পাইয়াছেন।

হেমচন্দ্রের প্রতি অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার পুস্তিকায় যে অবিচার করিয়াছেন, কোন্ ভাষায় তাহার নিন্দা করিব? হেমচন্দ্রের কবিতাবিশেষের প্রতি অক্ষয়চন্দ্র যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, আমরা হেমচন্দ্রের অসংখ্য গুণপক্ষপাতিগণের সহিত আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর মিলাইয়া সেই বাক্য পুনঃপ্রয়োগ করিয়া তাঁহার সমালোচন গ্রন্থ সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে বলিব যে উহা অক্ষয়চন্দ্রের অক্ষয় "কলঙ্ক"—সঙ্কীর্ণতার অন্ধকূপ হইতে উদার ও

হেমচন্দ্র

মহাপ্রাণ হেমচন্দ্রকে বুঝিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে "বিড়ম্বনা"।

৭। মণিকর্ণিকা। কাশীর মণিকর্ণিকা তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। একটি কাহিনী অবলম্বনে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল। ইহার এক স্থলে শিব শিবানীকে বলিতেছেন—

সুখের অবনীতল দুঃখ যত তায়—
ভাবিলেই দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ হয়।
জগৎ সৃজিত শিবে সরল প্রথায়
সরল ভাবিলে ভব সর্ব্বসুখময়।

মৃত্যুশোক বলি লোকে দুঃখ করে চিতে,
দেখেনা ভাবিয়া তত আহ্লাদের ভাগ
মানবের মৃত্যুশোক মানবেরি হিতে,
আগে সুখ—দুঃখ পরে জগতে সজাগ।

দিবানিশি কাল-অঙ্গে জড়িত যেমন,
আসে যায় লীলাময় তুলিয়া লহরী—
এই দিবা, এই নিশি, আবার তপন,
কে আগে—কে পরে কেহ না পায় বিচারি;

কে জানে নরের মাঝে সে নিগূঢ় কথা?
কিন্তু শিবে না থাকিলে ধরাতে সর্ব্বরী
দিবার আদর এত হতো না ক সেথা—
সেইরূপ সুখ দুঃখ বুঝহ শঙ্করী।

যে মানবের পরকাল-প্রথা—"দুর্ব্বোধ—দুর্জ্ঞেয় অতি, অপার—অশেষ"—তাহার পক্ষে উপরি উদ্ধৃত মহাবাণী জীবনযাত্রার সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই।

৮। ইউরোপ এবং আসিয়া।

আফগানিস্থান যুদ্ধের পর হিন্দুকুশ-চূড়ে "বাজিছে ব্রিটিশ ব্যাণ্ডে বিজয়ের বাজনা।" ইউরোপ প্রতিদিন উন্নতির পথে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, আর আসিয়াবাসী "অদৃষ্টে নির্ভর করি নামিতেছে পাতালে।" তাই স্বদেশপ্রাণ কবি হেমচন্দ্র আসিয়াবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তোমাদের দিবা সন্ধ্যা প্রাতঃকাল রজনী
সকলি সমান জ্ঞান!—
আছে কিনা আছে প্রাণ,
অন্ধ অথর্ব্বের প্রায়
ডাক খালি বিধাতায়,
বলিলে অদৃষ্টে দোষি তুষ্ট হ'বে তখনি?

কি দোষ রে বিধাতার—কিবা দোষ প্রাক্তনে
কি না, বল, দিলা বিধি ?
করিতে ধরার নিধি
বিধাতার সাধ্য যাহা দিয়াছে এ ভুবনে !

দিয়াছে এতই এরে, স্বপনেও কখন
ইউরোপ না হেরে তায় !
বল হে কোথা সেথায়
এমন পর্ব্বত, নদ,
এমন দারু, নীরদ,
এত খনি-জাত ধাতু, এত শস্য রতন !

কোথায়, সেখানে হায়, হেন রশ্মি তপনে !
এত জাতি ফুল ফল,
এমন নিশি শীতল,
দেখেছে পাশ্চাত্য কোথা হেন শশী-কিরণে !

সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি—
আমাদেরি হৃদি তলে
সে স্রোত নাহিক চলে
আশ্রয় করিয়া যায়
পাশ্চাত্য আগুয়ে ধায়
বাঁচিতে—মরিতে, হায়, জানিনা রে কেবলি !

৯। পদ্মফুল। প্রৌঢ় বয়সে "ভাবময় পদ্ম পুষ্প" দেখিয়া কবির মনে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইয়াছে—এই কবিতায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

এত যে লুকানো তোতে আগে ত জানিনে!
যৌবনেতে সুখোদয়
হায়রে সকলে কয়—
প্রৌঢ়-সুখ কাছে আমি সে সুখ মানিনে!
পরিণত সুখ বিনা সুখ কি জানিনে।

পদ্মের সহিত কবির মনের যোগ কিরূপে হইল তাহার কারণ কবি অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছেন—

ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন—
এত শোভা বাস যার
পঙ্কেতে জনম তার,
পঙ্কজ বলিয়া তারে ডাকে সাধুজন!
জানি না বিধির, হায়, রহস্য কেমন।
ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ম!
হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে
বাঁধিলা এ দেহপুটে?
কলুষ-পঙ্কেতে ফুটে,
তাই এত ক্ষিপ্ত মন ডোবে ভাসে বানে?

বুঝেছি, রে শতদল, অচ্ছেদ্য বন্ধনে
তাই তুই আমি বাঁধা,
এক সঙ্গে হাসা কাঁদা,
তাই, ওরে পদ্মফুল, এ মিল দু'জনে।
ভুলিব না তোরে, পদ্ম,
ভুলিব না—ভুলিব না—জীবনে মরণে!

১০। রেলগাড়ী। হেমচন্দ্রের অন্যান্য কবিতার ন্যায় এই কবিতাটীরও ছন্দ ও ভাষা যেন ভাবের প্রতিধ্বনি। কবিতার শেষভাগে ইংরাজজাতিকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন

অসুর অসাধ্য কাজ সাধিতেছ জগতে!—
জড়ে প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে,
পার না কি বাঁচাইতে নিৰ্জ্জীব ভারতে?"

১১। বিশ্বেশ্বরের আরতি। ইহার সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন, "কাশীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের আরতি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তদবলম্বনে এবং যে সকল ব্রাহ্মণেরা আরতি করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের সাহায্যে এই অনুবাদ করিয়াছি।

প্রায় অনেক স্থলেই মূলের শব্দগুলি ঠিক ঠিক আছে, তবে বাঙ্গালা ভাষায় পঠন ও ভাবগ্রহণ হইতে পারে তজ্জন্য যেখানে যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে তাহাই করিয়াছি।

১২। বাঙালীর মেয়ে। "বাঙালীর মেয়ে"কে উদ্দেশ করিয়া কবি এই যে রহস্যপূর্ণ কবিতাটি রচিত করিয়াছিলেন, তাহার রস রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই উপভোগ করিয়াছিলেন। নটরাজ অমৃতলাল বসু বলেন, হেমচন্দ্রের কবিতাগুলি যে সেকালে কিরূপ আদৃত হইত তাহা ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে তাঁহার কবিতা গুলির অনেক ব্যঙ্গানুকৃতি (parody) হইয়াছিল। অমৃতলাল স্বয়ং হেমচন্দ্রের কোনও কোনও কবিতার parody করিয়াছিলেন। 'বাঙ্গালীর মেয়ে' কবিতাটি সেকালে অনেকেরই কণ্ঠস্থ ছিল এবং উহার অনেকগুলি parody হইয়াছিল। "ভারতউদ্ধার"-কর্ত্তা ইন্দ্রনাথও 'বাঙ্গালীর ছেলে' শীর্ষক একটি ব্যঙ্গানুকৃতি করিয়াছিলেন। কিন্তু ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার উহার রস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালী মেয়ের

পীঠে কশাঘাত করা—কবির কলঙ্ক। কৈফিয়ৎ দিয়া কবি এই কলঙ্ক ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন,—বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি-প্রাপ্তি উপলক্ষে হেমচন্দ্র বলিতেছেন :—

যে ধিক্কারে লিখিয়াছি, 'বাঙ্গালির মেয়ে',
তারি মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে।

কিন্তু ধিক্কার বলিলে কলঙ্ক ক্ষালন হয় না।

হুঙ্কারে ফেটে পড়ে, চলে যান ধেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।

এ ত ঘোর মিথ্যা কথা। এমন মিথ্যা, কৈ মিল, মনক্রীফ্, মেকলেও চালাইবার চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাতে হেমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালীর মেয়ের এ দারুণ চিত্র তিনি কোথায় পাইয়াছেন? আত্মম্ভরিতায় ভর দিয়া, অথচ সহাস্য মুখে, বয়োজ্যেষ্ঠ সহোদরের মত উজ্জ্বল দৃষ্টি আমাদের চক্ষুর উপরি নিক্ষেপ করিয়া হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, 'আমি আমার মাতা, পত্নী, ভগিনীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি।' আমি স্তম্ভিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু ঈষৎ হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিয়া অন্য কথা পাড়িলেন।"

আমরা অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হইয়াছি, “আত্মম্ভরিতা” কাহাকে বলে হেমচন্দ্র তাহা জানিতেন না, তবে এই দোষটি তাঁহার কোনও বন্ধুর কিছু অধিক মাত্রায় ছিল। “আত্মবন্মন্যতে জগৎ” এই বাক্যানুসারে যদি কেহ হেমচন্দ্রকে বিচার করেন, তাহা হইলে অবশ্যই হেমচন্দ্রকে দোষী করা যায় না। হেমচন্দ্র যে যথার্থ নারীজাতিকে এবং স্বজাতীয়া মহিলাগণকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাহাদের উন্নতির জন্য নিরন্তর প্রয়াস পাইতেন, তাঁহার রচনাবলীতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বর্গীয়া লাবণ্যপ্রভা সরকার মহোদয়া এক স্থানে লিখিয়াছেন, “আমাদের দেশে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই দুই মহাত্মার পর অঙ্গুলির অগ্রে গণনীয় যে কয়জন প্রকৃত নারী-হিতৈষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কবিবর হেমচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার যে স্বদেশবৎসল হৃদয় স্বদেশের পরাধীনতা স্মরণ করিয়া ব্যথিত ও পীড়িত হইয়াছিল, তাহা ভারতনারীর অনন্ত দুর্গতি দেখিয়া অবিরল অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল।”

মিল, মনক্রীফ্, বা মেকলে, হেমচন্দ্রের নিকট বাঙ্গালীর মেয়েকে নিন্দা করিলে নিশ্চয়ই তাহার উপযুক্ত

প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইতেন। আমরা অনেক কন্যাবৎসলা জননীকে জানি, যাঁহারা অনেক সময়ে তাঁহাদের স্নেহের কন্যাকে 'হতভাগী' 'পোড়ারমুখী' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহার কন্যাকে ঐরূপ সম্বোধন করিলে সম্মার্জ্জনী হস্তে দৌড়িয়া আসেন। তিনি স্বয়ং কন্যাকে প্রভূত স্নেহ করিলেও কেবল তাহার মঙ্গলের জন্য—তাহার উন্নতির জন্যই—প্রয়োজন বোধ করিলে তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করেন। সে তিরস্কারে হলাহল নাই, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আছে। হেমচন্দ্র যদি 'ধারাপাতে মূর্ত্তিমান চারুপাঠ পড়া' বাঙ্গালীর মেয়েকে—নিজের ভগিনী বা দুহিতাকে—কোনও দোষের জন্য গালি দিয়া থাকেন, তাহা দোষের নহে। একজন বঙ্গমহিলা এই কবিতা পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

> "বাঙ্গালীর মেয়ে কিবা গালি সুমধুর!
> ব্যঙ্গচ্ছলে মনোব্যথা প্রকাশ প্রচুর।"

একজন সরলা বঙ্গমহিলা কবির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, অথচ অক্ষয়চন্দ্রের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? সরকার মহাশয় সুরসিক বঙ্কিমচন্দ্রের

যে ঈষৎ হাসির উল্লেখ করিয়াছেন, সে হাসি হেমচন্দ্রের উত্তর শ্রবণে কিংবা প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নে, সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই।

তবে এই কবিতাটি রচনার জন্য হেমচন্দ্রকে যে বাঙ্গালীর মেয়ের পদাঘাত সহ্য করিতে হয় নাই, তাহা বলিলে ইতিহাসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় নাম্নী এক 'বাঙ্গালীর মেয়ে' "বনপ্রসূন" নামক কাব্যগ্রন্থে 'বাঙ্গালী বাবু' শীর্ষক একটি কবিতায় হেমচন্দ্রকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত (সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত) সমালোচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার পরিচয় দিলে আশা করি পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না :—

"সকলেই জানেন, বাঙ্গালায় সাহিত্যসংগ্রামক্ষেত্রে, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় মহারথী। তাঁহার প্রতি শরসন্ধানে সাহস করে বাঙ্গালার পুরুষ লেখকদিগের মধ্যে এমন শূর বীর কেহ নাই। তাঁহার প্রণীত 'বাঙ্গালীর মেয়ে' নামক কবিতার জ্বালায়, অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে আজিও কাতর। আজি সেই আঘাতের প্রতিশোধের জন্য এই কাব্যবীরাঙ্গনা বদ্ধপরিকর—ধৃতাস্ত্র। হেমচন্দ্রের ঐ কবিতার উত্তরে

হেমচন্দ্র

মোক্ষদায়িনী 'বাঙ্গালির বাবু' শিরোনামে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটি বড় রঙদার—লেখিকার লিপি-শক্তিপরিচায়িকা—আদ্যোপান্ত পাঠের যোগ্য। আমরা এ কবিতাটী কিছু বাদ দিয়া প্রায় সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম—গ্রন্থকর্ত্রী আমাদের এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন ঃ—

কে নায় কে খায় অই, করে দড়বড়ি,
বাঙ্গালীর বাবু! হায় বড় তাড়াতাড়ি ;
সাহেব করিবে রাগ, বেলা হলে যেতে,
তাই এত তাড়াতাড়ি, নাইতে খাইতে।
চাপকান পেণ্টালুনে পোষাকের ঘটা,
শিরে শোভে শোলা পাকৃড়ী, শাল দিয়ে আঁটা ;
চেঙারির মত দৃশ্য কিবা চমৎকার!
দিতে কিছু দেরী হলে করেন চীৎকার ;
সে সময় ছেলে যদি বাবা বলে ডাকে
মারিতে উদ্যত হয়ে খিঁচ্য়ে যান তাকে।
তাড়াতাড়ি করে অন্য সব কর্ম্ম হয়,
তামাক টানিতে থাকে যথেষ্ট সময়,
টানিতে টানিতে ধূম, দয়া হলে মনে
শিশুরে সান্ত্বনা করা উচ্ছিষ্ট পানে।
গাড়ি ভাড়া পাঁচ পয়সা, চল্‌তে হন কাবু,
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু।

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু!
দশটা হতে চারটাবধি দাস্যবৃত্তি করা
সারাদিন বইতে হয় দাসত্ব পশরা।
উকীল, ডেপুটী কেহ, কেহ বা মাষ্টার,
সবজজ, কেরাণী কেহ, ওভারসিয়ার,
বড় কর্ম্ম বড় মান, অহঙ্কার কত
ধরারে দেখেন বাবু সরাখানা মত।
সারাদিন খেটে খেটে, রক্ত উঠে মুখে
পেগের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে।
'বড় কর্ম্ম করি' ভেবে, দেমাকে অজ্ঞান,
এদিকে সাহেব দেখে হৃদি কম্পমান,
সাহেব দেখে মান্য করা, ইংরাজী বুলি,
হদ্দ হলো নিজ ভাষে দেন তারে গালি;
শিখিয়া ইংরাজি ভাষা বড় অহঙ্কার,
তাড়াতাড়ি যান দিতে ইংরাজি লেক্‌চার,
কহিতে ইংরাজি বুলি খান হাবুডুবু,
শুনে যা, ইংরাজি কয়, বাঙালির বাবু।

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু!
খোলা হয় ধরাচুড়া গোলামির ভার,
ঘরে এলে খোলা গায়ে চটিতে বাহার;
পরিধান থান ফাড়া চাকর কোঁচানে,
সিলিপার কারু পায়ে চটি ঠনুঠনে।

আয়েস তামাক পানে, তাকিয়া হেলন,
হুঁকা নল মুখে দিলে স্বর্গে আরোহণ।
বৈঠকখানা গুলজার, হাসির ধমকে ;
পাপোশেতে থুথু ফেলা, পিকদানি সম্মুখে।
নাহি কোন ধর্ম্মচর্চ্চা, শুয়ে গীত গান
মধ্যে মধ্যে হুঙ্কারেন 'পান তামাক আন।'
সম্মুখে সেজের আলো, ভ্যারাণ্ডার তেলে
মর্দ্দানি ফলান হয়, মূর্খ কেহ এলে।
ইয়ার এলে খেলা হয়, দাবা কিম্বা গ্রাবু,
হায় হায় অই বোসে বাঙালির বাবু।

*　　*　　*

হায় হায় অই যায় বাঙালীর বাবু।
ছড়ি হাতে, সুজ পায়ে, মুখেতে চুরোট,
কাহারো সাহেবি চাল পরা হ্যাট কোট,

*　　*　　*

ফরশা হতে বড় সাধ সাবাং মাখা কোসে,
উঠে যায় ছাল চামড়া, তোয়ালেতে ঘোসে।
সোজা সিঁতে কাটা চুল, আলবার্ট ফ্যাশান,
সেণ্ট মেখে গন্ধ গোকুল, হন মূর্ত্তিমান।

*　　*　　*

নাটক দেখিতে সাধ সখে ভরা প্রাণ,
মুচকে মুচকে হাসিটুকু, গালে ভরা পান ;
একসেণ্ট এনুকোরে যেন ছাড়ে বৃষ নাদ,
ধুম টেনে দম রাখা দোকানি প্রসাদ।
ঋণে মাথা ডুবে আছে, সখে মত্ত তবু
হায় হায় অই যায় বাঙালির বাবু।

যিনি নাহি মদ খান তাঁর অহঙ্কার
বুঝি বা যে করিলাম ভারত উদ্ধার,
নাম লিখায়ে ব্রাহ্ম হন, ধর্ম্মগজে পেটে,
দোকানি পশারি তাক বক্তৃতার চোটে
স্বাধীন করিতে নারী হন ব্রহ্মজ্ঞানী,
আনেন বাহির করি কুলের কামিনী ;
মদ্যপায়ী মদখেয়ে, খুলে দেয় মন
ভারত উদ্ধার হেতু হয় আস্ফালন
কথা কন খই, মুড়কী, ইংরাজী, বাঙালী
মন খুলে ইংরেজেরে দেন গালাগালি
লীলাখেলা বাবুদের যত রাত্রিকালে
মুখ বুজে ভদ্র হন সকাল হইলে।

* * *

"এখন আমাদের দুইটি জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম, বাঙ্গালী বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা ক'র, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনীর

এই পদগুলির আঘাত, সহ্য হইবে কি? দ্বিতীয় হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি, মিষ্ট লাগে কি? সেবার মহারাজ্ঞীর পুত্র ভারতবর্ষে আসিলে কবি যাহা পাইয়াছিলেন, তাহার অধিক কিছু হইল কি?" *

---

* কবি কি পাইয়াছিলেন পাঠকগণের স্মরণ আছে কি?—

"কান্তা আসি হাস্যমুখে বলে কই দেখি।
কি পাইলে কাব্য লিখে সোণা কিংবা মেকি॥
* * * *
দেও দেখি গুণমণি কি পেলে শিরোপা।
বুলু রিবন চাকি চাকতি কিংবা জরির থোপা॥
কবি কবে পায় কিবা, কি দেখাব ধনি।
না বলিতে রাঙা ঠোঁট ফুলায়ে তখনি॥
ধাক্কা দিয়ে গরবিণী গরগরিয়ে যায়।
ফাঁফরে পড়িয়া কবি ফ্যাল্ ফ্যাল চায়॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:*:—

'ছায়াময়ী'।

ছায়াময়ী। কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের দুই সপ্তাহের মধ্যে হেমচন্দ্রের আর একখানি অভিনব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়া' নামক অদ্বিতীয় কাব্যের "কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে" হেমচন্দ্র "ছায়াময়ী" রচনা করেন। মুখপত্রে তিনি স্পেন্সারের দুইটি পদ

I follow here the footing of thy feete
That with thy meaning so I may there rather meete"

অনুবাদিত করিয়া লিখিয়াছিলেন"—

"তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া চলেছি তোমারি পথে,
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে, ধরি এই মনোরথে।

এবং বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন "সেই মহাকবি (দান্তের) নিকট আমি কতদূর ঋণী, তাহা ইহার ললাটস্থ শ্লোক দৃষ্টেই বিদিত হইবে। ফলতঃ বহুল

পরিমাণে আমি তাঁহার ভাবেরও রচনা প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। "কলিকাতা গেজেটে গ্রন্থখানির প্রকাশকালে নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয় :—

পুস্তকের নাম 'ছায়াময়ী' (Full of shadow) কাব্য। কলিকাতা ৩৫ বেনিয়াটোলা লেন রায় যন্ত্রে বিপিন বিহারি রায় দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৪ কলেজ স্কোয়ার রায় প্রেস ডিপজিটরীতে প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ১৫ই জানুয়ারী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। পত্রসংখ্যা ১৪২ ডুয়োডেসিমো। প্রথম সংস্করণ ৫৫০ ছাপা হইল। মূল্য ৸৹ মাত্র। গ্রন্থসত্ত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর। মন্তব্য—The nature of this poem is explained by its name. It contains pictures of the horrors of hell.

কেহ কেহ মনে করেন ছায়াময়ী দান্তের গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। এই ধারণা ভ্রান্ত। কবি স্বয়ং বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "ডিভাইনা কমেডিয়া বাইবেলের মতাবলম্বী একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট উপাসকের বিরচিত। নরক প্রায়শ্চিত্ত-নরক (Purgatory) এবং স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে যে সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুমোদিত। এই পুস্তকে যাহা

লিখিত হইয়াছে, তাহা সে সকল মত ও উপদেশ হইতে অনেক বিভিন্ন।"

হেমচন্দ্র স্বয়ং বোধ হয় জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রুত একটি কৌতুকাবহ গল্প বিবৃত হইতে পারে। একদা ৺নীলমণি কুমার মহাশয়ের বাটীতে হেমচন্দ্র, শ্যামাচরণ বাবু এবং তাঁহাদের অন্যতম বাল্যবন্ধু (সবজজ) আনন্দপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার বহুবৎসর পূর্ব্বে আনন্দ বাবুর পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছিল। নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে হইতে, পরলোকের কথা উঠিল। আনন্দবাবু এইরূপ ভাবে কথা কহিলেন যেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী তৎকালে স্বর্গে বিরাজমানা আছেন। হেমচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তিনি স্বর্গে আছেন কে বলিল? আমার বোধ হয় তিনি ইহলোকেই অন্য কোথাও জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। হয়ত এতদিনে তাঁহার অনেকগুলি পুত্রকন্যাও হইয়াছে।" তাঁহার এই কথায় বন্ধুগণ সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

ছায়াময়ী কাব্য 'পল্লব' নামক সাতটি পরিচ্ছেদে

বিভক্ত। সংক্ষেপে ইহার আখ্যানভাগের পরিচয় দিব। কোন ব্যক্তি তাহার প্রিয়তমা দুহিতার বিয়োগে কাতর হইয়া, কন্যার শব ক্রোড়ে করিয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, অবশেষে একদিন সন্ধ্যাকালে ভূতপ্রেতের লীলাভূমি এক শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেই শ্মশানের বর্ণনায় কাব্যের আরম্ভ। এই শ্মশান-বর্ণনাটি অতি সুন্দর। অক্ষয়চন্দ্রের ন্যায় অনত্যুদার সমালোচকও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, "ছায়াময়ী দান্তে হইলেও ইহার প্রস্তাবনা—ভাষায় ও ছন্দে—বাঙ্গালায় অতুল্য।" বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "ছায়াময়ীর সূচনায় শ্মশানবর্ণনার রৌদ্র-বীভৎস বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য।—

সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি ;
ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি !
হী হী শবদে অটবী পূরিছে
জাগিছে প্রমথগণ,
অট্ট হাসেতে বিকট ভাষেতে
পূরিছে বিটপী বন।

কুট করতালি কবন্ধ তালিছে,
ডাকিনী দুলিছে ডালে,
বিল্ববিটপে ব্রহ্ম পিশাচ
হাসিছে বাজায়ে গালে।"

এই শ্মশানে ভূতপ্রেতদিগের বীভৎস ক্রীড়া দেখিয়া, সেই ব্যক্তির মনে মানুষের পরকাল, সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিষয়ে নানা চিন্তার উদয় হইল। তিনি প্রেত-মূর্ত্তিগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বল্ কোথা বল্ কোথা পরকাল,
কি প্রথা সেখানে, ভোগে কি জঞ্জাল,
জীবদেহ হ'তে কৃতান্ত করাল
জীবাত্মা যখন খেদায় দূরে?
পড়ে থাকে দেহ—কোথা বা পরাণী
কলুষে অঙ্কিত জীবনের গ্লানি
করে প্রক্ষালিত,—কি সলিল আনি?
থাকে কতকাল, কোথা—কি পুরে?
আছে কি ঔষধি—আছে কি উপায়,
পাপের কলঙ্ক যাতে ঘুচে যায়,
পাপীর পরাণ আবার জীয়ায়,
জীব-চিত্ত-শিখা কভু কি নিবে?

* * *

ভুলে কি পাতকী ত্যজিলে জীবন
ইহ-জন্মকথা, এ মর্ত্ত্য ভুবন ?
স্মৃতি-চিন্তা-ডোর, জীবের বন্ধন
মাটীতে পুনঃ কি মিশায়ে যায় ?

* * *

আছে কিরে পার সে পাপের হ্রদে,
ডুবে যাচ্ছে নর পড়িয়া প্রমাদে
বিষাক্ত জীবন ভোগে রে বিষাদে,
আছে কি পশ্চাতে নিষ্কৃতি তার ?

ভূতপ্রেতগণ এই প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিতে লাগিল। একজন বলিল—

"আমি বলি যায়—করিস্ প্রত্যয়,
দেহান্তে মানব কিছুই না হয়,
মাটীর শরীর মাটীতেই রয়,
দেহ মন গড়া একই ছাঁচে।"

এমন সময় ভূতদলপতি সহসা আবির্ভূত হইয়া ভূতগণকে আদেশ করিলেন—

"নিকটে উহার না যাও কেহ ;
শোক দুঃখ তাপে যে নর পীড়িত,

মৃত্যুর অঙ্গুলি যার দেহে স্থিত
তাহার নিকটে জগৎ স্তম্ভিত,
না লঙ্ঘে কেহ রে তাহার দেহ ॥

ভূতগণ সেইস্থান পরিত্যাগ করিলে, সেই বিজন শ্মশানে বসিয়া সেই ব্যক্তি ভাবিতে লাগিলেন—

সত্য কি পিশাচ-বাক্য—শরীর বিনাশে
পরাণী বিনাশ পাবে?   পাংশু ক্ষারে মিশে যাবে?
ভাবিতে হবে না কিছু ভাবীর তরাসে?

তাঁহার সেই সুপবিত্রা নির্ম্মলপ্রাণা দুহিতা কোথায়—কোন লোকে বিরাজ করিতেছে? সেও কি প্রেত-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পিশাচীদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? ইহা ত বিশ্বাস হয় না।

"নহে—নহে কদাচন না মানি প্রত্যয়
ব্রহ্মা যদি নিজে বলে   সে প্রাণী ওরূপে চলে,
সে আত্মার শেষ এই অন্ধ নিশিময়।

*   *   *

পরকাল আছে সত্য;   আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত
জগত নিয়ন্তা বিধি   অবশ্য করিলা বিধি
যেরূপে উদ্ধার পাবে ভ্রমান্ধ যাহারা।"

যখন সেই ব্যক্তি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন সেই সময়ে "জ্যোৎস্নাময় গগনের কোল হতে" অকস্মাৎ "দেবী এক তারাগতি নামি এল ভবে।" দেবী কহিলেন—

তাপিত না হও দেহী ভবতলে কেহ নাহি
কলঙ্কিত নহে যেবা পাপ-পরশনে।

* * *

পরিপূর্ণ নির্ম্মলতা এ জগতে নাই,
পৃথিবীর নহে তাহা, সে বাসনা বৃথা স্পৃহা
মানব মণ্ডলে কেহ ধরিয়া মানব দেহ
যদি করে সে বাসনা সে আশা বৃথাই।

কিন্তু তিনি ইহাও বলিলেন—

দুষ্কৃতির আছে ক্ষয় সন্তাপ অনন্ত নয়
পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ।

তিনি তাঁহার দুহিতার শবের দাহসংস্কার করিতে বলিলেন—

"মৃত্যুস্পর্শ দেহ যাহা রাখিতে নাহিক তাহা
অমৃত জীবের বাসে—বিধিবাক্য সার।"

এবং তাঁহার অদেহ দুহিতাকে দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অনন্তর দুহিতার দেহ সংস্কারান্তে সেই মানব দেবীর সহিত উর্দ্ধে নক্ষত্রলোকে চলিয়া গেলেন। এই নক্ষত্র মণ্ডলে জীব-আত্মা কর্ম্মফল ভোগ করে।

দেহত্যাগে জীব-আত্মা পরমাত্মা দেশে,
যাহার যে দুঃখ ফল ভুঞ্জিবারে সে সকল
যেখানে আদেশ পায় সেই সে মণ্ডলে যায়,
পৃষ্ঠতল ভেদ করি অন্তরে প্রবেশে।

যত কাল শেষ নহে জীবন আস্বাদ
অনুতাপ শিখানলে, ততকাল সেই স্থলে,
থাকে সে পরাণীপুঞ্জ ভুঞ্জিতে বিষাদ।

সে লালসা নির্ব্বাপিত হয় যেই ক্ষণে
সেই ক্ষণে মুক্ত প্রাণী তেয়াগি শরীরী-গ্লানি,
সূর্য্য-আভা অবয়বে, প্রকাশিত পুনঃ সবে,
ত্যজয়ে সে লোকগর্ভ নিস্তাপিত মনে।

তাদেরি অঙ্গের শোভা, কিরণ আকারে,
কাঁপি কাঁপি ঝিকি ঝিকি তারা-অঙ্গে ধিকি ধিকি
চমকে মানবচক্ষে শর্ব্বরী আঁধারে।

পাপ-মুক্ত প্রাণীবৃন্দ বিহরে তখন
ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করি, তাপিতের তাপ হরি,
হিতব্রতে সদা রত আপন সামর্থ্য মত
বিধির বাঞ্ছিত কার্য্য করিতে সাধন।

কত হেন মুক্তজীব মানব মণ্ডলে
ভ্রমে নিত্য নিশাকালে, ঘুচাতে ভ্রান্তির জালে,
দেখাতে সরল পথ বিপথী সকলে।"

এই সকল নক্ষত্রের অভ্যন্তরভাগে পাপাচারী জীবাত্মারা কিরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, দেবীর কৃপায় মানব তাহা দেখিতে পাইলেন। মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকগণ এক স্থানে ঘুরিতেছে—তাহাদের উদ্দেশ্য স্থান নাই—

"কি দুঃসহ সে যাতনা,
কি নিরাশা সে কল্পনা—
বাসনা থাকিতে চিত্তে ফলেতে বঞ্চিত!"

টৈথস ওট (Titus Oates), এণ্টনি, ভারত-কলঙ্ক শকুনি প্রভৃতি এই নরকে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। অন্য লোকে "পরদ্রব্য-অপহারী, মহাপ্রাণী-হত্যাকারী" পাপীরা পাপের শাস্তি ভোগ করিতেছে। কংস, নীরো,

সিরাজুদ্দৌলা প্রভৃতি এই লোকে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে—

"বুঝি নাই ধরা-মাঝে—ঐশ্বর্য্য-উন্মাদে—
লোকপতি হ'তে হলে কত সাম্য ধৃতি বলে
লোকেরে পালিতে হয়, কেন বলে ধর্ম্মময়
লোকপালে ধরাতলে—বুঝেছি বিষাদে।

নরকের এই সকল ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে সেই ব্যক্তি দেবীকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে এবং তাঁহার দুহিতাকে দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাকে শোকে মুহ্যমান দেখিয়া দেবী বলিলেন

"জীবন থাকিতে পরকাল ভেদ যে জন ভেদিতে চায়,
পতঙ্গ-শরীরে খগেন্দ্রের বল ধরিতে হইবে তায়।

মন ধৈর্য্য মানিতেছে না, কিন্তু

"জানিও নিশ্চয় মানস দমনে মানুষেরই অধিকার;
হৃদয় রাজ্যেতে শাসন রাখিতে সহায় নাহিক তার।

অতঃপর দেবী তাঁহাকে অন্যান্য নরক দেখাইলেন। একস্থানে ব্যভিচারিণী স্ত্রীগণের মধ্যে দেবগুরুভার্য্যা তারা, অশুচি প্রণয়ে আসক্তা বিদ্যা, এবং মিশর রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রাকে দেখিতে পাইলেন। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, অন্নদামঙ্গল পাঠ করিয়া ভারতচন্দ্রের বিদ্যাকে অসতী বলিয়া কাহারও প্রতীতি জন্মে

না, সুতরাং বিন্ধাকে নরকে ফেলা সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু এ কথা বোধ হয় ন্যায়রত্ন মহাশয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, যে যুগে হেমচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং যে সমাজের জন্য তাহার গ্রন্থ রচিত, সে যুগে সে সমাজে, বিন্ধাকে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব।

বিবিধ নরক প্রদর্শন করিয়া এবং সর্ব্বশেষে বিশ্ব-কেন্দ্রস্থ ধর্ম্মরাজের বিচারপ্রণালী দেখাইয়া দেবী তাঁহাকে মর্ত্তধামে আনিয়া বলিলেন—আমিই তোমার কন্যা

"এবে অবিনাশী
আত্মাময় এ শরীর—ঘুচেছে স্বপন!"

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, "গ্রন্থকারের কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি যেরূপ উচ্চ, তাহা বৃত্রসংহার কাব্যের সমালোচনায় বলা হইয়াছে; এ কাব্যেও তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে।" কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, "পর-কালে স্বর্গ নরক দুই আছে বলিয়াই সাধারণের সংস্কার। যিনি পাঠকদিগকে একটির বিভীষিকা দেখাই-লেন, অপরটির প্রলোভনও তাঁহার দেখান কর্ত্তব্য ছিল।" হেমচন্দ্র বাইবেলের মতাবলম্বী অনন্তনরক-বাদী কবি দান্তের অমর কাব্যের "কিঞ্চিন্মাত্র আভাস

প্রকাশ করিবার মানসে" এই কাব্য রচনা করেন, বোধ হয় সেই জন্যই স্বর্গ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় অপর একস্থলে লিখিয়াছেন, "ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে পরকালাদি বিষয়ের প্রশ্ন সকল উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে আশা জন্মিয়াছিল—যে সে সকল প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা হইবে। কিন্তু তাহা কিছুই হয় নাই।" এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা বড় সহজ নহে। যুগ যুগান্তর ধরিয়া প্রকৃতির রুদ্ধদ্বারে মানুষ এই প্রশ্ন করিতেছে; কিন্তু উত্তর পায় নাই। কবি কর্তৃক উহার উত্তর সংক্ষেপেই অথচ অভ্রান্ত ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে,—

পরকাল আছে সত্য, আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত

* * *

দুষ্কৃতির আছে ক্ষয় সন্তাপ অনন্ত নয়,
পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ।

দার্শনিকের রাজত্ব যেখানে শেষ, কবির রাজত্ব সেইখানে আরম্ভ। সেই জন্য দার্শনিক যাহা বলিতে পারেন না—কবি তাহাও বলিয়াছেন। মানুষ ইহা অপেক্ষা অধিক বলিতে পারে না। কিন্তু মানবের জীবন-সমস্যার সমাধানে কবিবর হেমচন্দ্র আরও অনেক

দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার "দশমহাবিদ্যা"র আলোচনাকালে আমরা এই প্রসঙ্গের পুনরালোচনা করিব।

"ছায়াময়ী" সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয় একস্থানে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই কাব্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেন :—

"হেমচন্দ্রের ভাষা এবং ছন্দোবন্ধ উভয়ই এই কাব্যে বৈচিত্র্য এবং বিস্তারলাভ করিয়াছে। ফলতঃ 'বৃত্র-সংহার' কাব্যের রচয়িতার শিক্ষা, চিত্ত-স্থৈর্য্য, নিপুণতা, শক্তি এবং উদ্দাম কল্পনার পরিচয় 'ছায়াময়ী'তে পূর্ণ-মাত্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা। সরস্বতীর অর্চ্চনার জন্য হেমচন্দ্র যে বিপুল স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কমলার 'মণিময় ধূলি-রাশি' উপেক্ষা করিয়া হেমচন্দ্র কিরূপ একনিষ্ঠার সহিত সাহিত্যসেবায় জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাঠকগণ পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই উদ্যোগী পুরুষসিংহকে লক্ষ্মী একবারে পরিত্যাগ করিতে

পারেন নাই। হাইকোর্টে ওকালতীতে হেমচন্দ্রের আয় হ্রাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি ও ব্যবহার শাস্ত্রে বিচক্ষণতার জন্য এই সময়েও প্রথম শ্রেণীর উকিল বলিয়া পরিগণিত হইতেন। হেম-চন্দ্র কাব্যাদি রচনায় কিরূপ যত্ন লইতেন তাহা পাঠক-গণকে বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি কোনও রচনা প্রকা-শের পূর্ব্বে শতবার তাহা পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত করিতেন। এই কার্য্য সময়সাপেক্ষ। হাইকোর্টের প্রথম শ্রেণীর উকিলের পক্ষে এই জন্য অবসর করিয়া লওয়া সহজসাধ্য নহে। * কিন্তু হেমচন্দ্র তাঁহার সম-

* কবিবর নবীনচন্দ্র সেন একবার (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে) হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। "বৃত্রাসুর মরিল কি বাঁচিল তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না"—সেই জন্য নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্রকে ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া একটি কাব্য লিখিতে পরামর্শ দেন। আমাদের অনুমান, 'পলাশীর যুদ্ধ'-লেখকের নিকট পরাস্ত হইবার ভয়ে হেমবাবু এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক এই প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের সহিত হেমচন্দ্রের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনী হইতে এস্থলে উদ্ধারযোগ্য।

"তিনি (হেমচন্দ্র) বলিলেন তাঁহার লেখা শেষ হইয়াছে।

য়ের সুন্দর বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন এবং সচরাচর নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নিয়মিত ভাবে সম্পাদিত

ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া আমাকে (নবীনচন্দ্রকে) লিখিতে হইবে। আমার মত ভাষার উপর তাঁহার অধিকার নাই। আমার ভাষা যেন জলের মত বহিয়া যায়। আর তাঁহার হস্তলিপি দেখিলে আমি পড়িতে পারিব না, উহা এত কাটা। আমি বলিলাম, সে ঠিক। আমার জন্মস্থান চট্টগ্রাম, বাঙ্গালা একরূপ আমার মাতৃভাষা নহে বলিলেও চলে। তাঁহার জন্ম স্থান নিজ কলিকাতা। অতএব তাঁহার অপেক্ষা আমার বাঙ্গালা ভাষার উপর অধিক অধিকার হইবারই কথা! আর তাঁহার হস্তলিপি কাটা হইবারই কথা। তিনি যাহা লেখেন, তাহা তাঁহার বন্ধু বঙ্কিমবাবু, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্র ঘোষ মহাশয়েরা সমালোচনা করিয়া কাটান। আমার লেখা কাটাইবে কে? আমি দেশের নিভৃত স্থানে বসিয়া লিখি। সেখানে সাহিত্যের 'স'ও কাহারও মুখে নাই। লিখি আমি, পড়েন ও সমালোচনা করেন স্ত্রী, তাহার পর ছাপিতে যায়। অতএব আমার হস্তলিপিতে একটা শব্দও কাটা নাই। তিনি তাহার পর বলিলেন, তাঁহার অপেক্ষা আমার লিখিবার অবসর অনেক বেশী। তিনি মোটে লিখিবার সময় পান না। আমি বলিলাম, সে কথাও ঠিক। হাইকোর্ট বৎসরে প্রায় ছয়মাস বন্ধ। আর আমি তিন বৎসর হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর পীড়িত হইয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিলে তবে তিন মাস ছুটী

করিতে চেষ্টা পাইতেন। প্রাতঃকালে তিনি মক্কেল-দিগের সহিত কথোপকথন ও তাহাদের কার্য্য করি-তেন। আহারান্তে হাইকোর্টে যাইতেন। হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কথোপ-কথনে অথবা নূতন পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি পাঠে কালাতিপাত করিতেন। পরে আহারাদি করিয়া

পাই! তিনি এবার অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আপনি আমাদের দুর্গতি জানেন না। আপনারা মাস শেষ হইলেই একটা নির্দ্দিষ্ট বেতন পান, অতএব কোনও ভাবনা থাকে না। আর আমাদের যেদিন মক্কেল জুটিল, সেদিন নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাই না! আর যেদিন না জুটিল, সে দিন হাহাকার করিয়া কাটাইতে হয়। বন্ধের সময়ও সে ভাবে যায়।" আমি এবার হাসিয়া বলিলাম---"বিচার মন্দ নহে। আপনি একজন হাইকোর্টের প্রথম শ্রেণীর উকিল। মাসে দুই তিন হাজার টাকা পান। আর আমি সমস্ত মাস খাটিয়া পাই তিন শত টাকা। অতএব আমার অপেক্ষা আপনার হাহাকারটা বেশী হইবার কথাই বটে!" বিদায় হইয়া আসিবার সময় ঈশান হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তুমি দাদাকে বড়ই অপ্রস্তুত করিয়াছ। কিন্তু উনি যাহা বলিলেন সকল কথাই ঠিক।' আমি বলিলাম, "ঈশান জগতে বুঝি তৃপ্তি একটা জিনিষ নাই। প্রত্যেক গোলাপেরই কাঁটা আছে।"

রাত্রি ৮॥টা ৯টার সময়ে শয়ন করিতেন ও নিদ্রা যাই-তেন। রাত্রি ২টা ২॥টার সময় উঠিয়া কাব্যাদি রচনা করিতেন বা পূর্ব্বরচনা সংশোধিত করিতেন। তিনি তাঁহার রচনার এত পরিবর্ত্তন করিতেন যে মূল রচনাটির সহিত সংশোধিত রচনার প্রায় কিছুই মিলিত না। তাঁহার এই রাত্রিজাগরণ করিয়া কবিতারচনার এবং অনবরত কাগজ ছিঁড়িয়া রচনা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে লিখিবার প্রথা 'বাজি মাতে' তাঁহার পত্নীর উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয়—

"বড় জ্বালাতন কর জেগে সারা রাতি।
কালি ফেলে কাগজ ছিঁড়ে পুড়িয়ে মোমের বাতি॥

অবশ্য ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অপেক্ষা সাহিত্যের দিকেই হেমচন্দ্রের আকর্ষণ বেশী ছিল। একবার ৺নীলমণি কুমার মহাশয়ের ভবনে কোন নিমন্ত্রণ উপ-লক্ষে সমাগত হেমচন্দ্রের সহিত কুমার মহাশয়ের বাল্যবন্ধু পূজনীয় শ্রীযুক্ত নীলমণি দে* মহাশয়ের সাক্ষাৎ

---

* চট্টগ্রামের কমিশনার এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে C. I. E., I. C. S. মহো-দয়ের পিতা এবং লেখকের মাতামহ।



শ্রীযুক্ত নীলমণি দে

হইলে তিনি হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "হেমবাবু, আপনি হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল, আপনি বাঙ্গালা কাব্যাদি রচনার সময় পান কি করিয়া ?" হেমচন্দ্র যে উত্তর দেন তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য। তিনি বলেন, "কি করিয়া কাব্য লিখি তাহা জানি না, তবে আমার ইচ্ছা হয় যদি কেহ আমার পরিবার ও আশ্রিতগণের ভরণপোষণের ভার লন, তাহা হইলে আমি আমার জীবনের সমস্ত সময় বাণীর চরণে উৎসর্গ করিয়া জীবন সার্থক করি।" হেমচন্দ্র যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, প্রাণপণে তাহা সম্পাদিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। তিনি যে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন, তাহা উপযুক্তভাবে চালাইবার জন্য যথোচিত পরিশ্রম করিতেন। হাইকোর্টের বর্ত্তমান জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বলেন, "আমরা হেমবাবুর নিকট steadiness এবং সকল কার্য্য নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করিতে শিক্ষা করি।" হেমচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু পরলোকগত সবজজ কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয়ের এক পৌত্র বলেন যে কান্তিবাবু বলিতেন, "হেমচন্দ্রের ওকালতীতে সাফল্যের প্রধান কারণ, তিনি argument



৺কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী

করিবার সময় কখনও temper lose করিতেন না; Judgeদের সহিত কোনরূপ ঝগড়া করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই, সর্ব্বদাই cool থাকিতেন। একদিন তাঁহার argument শুনিতে গিয়াছিলাম joint-hood ও separation এর উপর argument হইতেছিল; হেমবাবু joint coffer prove করা কি কি কারণে শক্ত বলিতে চাহেন; কিন্তু evidence on record deal করিতে বলা হয় যাহাতে তিনি বৃথা সময় নষ্ট না করেন; যতবার বলিতে যান, ততবারই তাড়া খান; কিন্তু তাহাতে কোনরূপ বিরক্ত না হইয়া হাসিয়া এরূপভাবে evidence deal করিতে লাগিলেন যাহাতে পূর্ব্বের reasons গুলি deal করা দরকার হইয়া পড়িল; তখন জজেরা তাঁহাকে সে বিষয়ে deal করিতে নিজেরাই বলিলেন। জজেদের মধ্যে একজন স্বয়ং Louis Jackson ছিলেন। হেমচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান গুণ—কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা,—এবং ইহাই তাঁহার সাফল্যের প্রধান কারণ।"

বঙ্কিম-পরিবারের সহিত আত্মীয়তা।—এই পরিচ্ছেদ সমাপ্তির পূর্ব্বে হেমচন্দ্রের পারিবারিক

জীবনের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব। সুন্দরী 'চঞ্চলা' এবং মহাবীর 'বজ্রের' শুভমিলনে 'ঘটকালী' করিবার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "চিরপ্রথিত রূপ ও বলের সংযোগ বাহ্য প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ।" হেমচন্দ্রের অলৌকিকী প্রতিভার বজ্রতুল্য তেজের সহিত বঙ্কিম-চন্দ্রের লীলাময়ী প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন বাঙ্গালীর মানসরাজ্যে যে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিল তাহা আরও চমকপ্রদ। দুইটি অসাধারণ প্রতিভার সম্মিলনে—দুইজন অসাধারণ মনীষীর ভাবের আদান প্রদানে—বাঙ্গালা সাহিত্য অমূল্য রত্নের অধিকারী হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সময়ে হেমচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের সামাজিক আত্মীয়তাও সংঘটিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্রী—ডেপুটি কলেক্টর যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ইচ্ছাময়ীর সহিত হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অতুলচন্দ্রের বিবাহ এই সময়েই সংঘটিত হয়। এই বিবাহ সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের এক জামাতা আমাদিগকে যে কাহিনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা হইতে হেমচন্দ্রের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব সুপরিস্ফুট হয় বলিয়া আমরা উহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"বহুদিবস পূর্ব্বে এক সময় হেমচন্দ্র সপরিবারে নৌকাযোগে গঙ্গায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। নৈহাটীর ঘাটে যখন নৌকা আসে তখন তথায় তাঁহারা একটি ৫।৬ বৎসর বয়স্কা পরমা সুন্দরী বালিকাকে দেখিতে পাইলেন। হেমচন্দ্রের জননী সেই বালিকাটিকে দেখিয়া বলেন, "আহা আমার যদি এই রকম একটি পৌত্রবধূ হইত!" পরিচয়ে জানা যায়, সেই বালিকা যজ্ঞেশ্বর বাবুর কন্যা। সেই সময় উভয় পরিবারে ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হইলে স্থিরীকৃত হয় যে, উক্ত কন্যার সহিত যথাসময়ে হেমচন্দ্রের প্রথম পুত্রের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পরেই যজ্ঞেশ্বর বাবুর মৃত্যু হয়। কন্যার বিবাহের বয়স হইলে যজ্ঞেশ্বর বাবুর স্ত্রী হেমচন্দ্রকে জানান যে, তাঁহাদের সে অবস্থায় তাঁহারা হেমচন্দ্রের সহিত কুটুম্বিতা রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া অন্যস্থানে তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কারণ তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, হেমচন্দ্র হয়ত এ বিবাহে রাজী হইবেন না। হেমচন্দ্র কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভুলেন নাই। তিনি যজ্ঞেশ্বর বাবুর স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির



হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ ৺ইচ্ছাময়ী দেবী

করেন। যথাসময়ে তিনি তাঁহার নিজ বাড়ী হইতে সমস্ত দ্রব্য ও অর্থ—যাহা কিছু যজ্ঞেশ্বর বাবুর স্ত্রীর প্রয়োজন হইতে পারে তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহা—কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া, দিয়া মহাসমারোহে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবুর পত্নীর অবস্থার কথা তিনি কাহাকেও জানিতে পারিবার অবকাশ দেন নাই।"

এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, বন্ধুবর বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সম্পর্কে হেমচন্দ্র একস্তর নামিয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, হেমচন্দ্র তাঁহাদের বাটীতে আসিলে, পূর্ণবাবুর বালক পুত্র (এক্ষণে অবসরপ্রাপ্ত সবজজ) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কৌতুক করিয়া "বৈবাহিক মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—:*:—

"দশমহাবিদ্যা"।

"দশমহাবিদ্যা"। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হেমচন্দ্রের একখানি অভিনব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তাঁহার "দশমহাবিদ্যা" ছন্দের মাধুর্য্যে, ভাবের চমৎকারিত্বে ও ভাষার মনোহারিত্বে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়াছে। উহার প্রকাশকালে কলিকাতা গেজেটে নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়:—

পুস্তকের নাম 'দশমহাবিদ্যা'—the ten forms of *Sakti*—গীতিকাব্য। ২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে আই সি বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ২২শে ডিসেম্বর ১৮৮২ পত্রসংখ্যা ৫৪ ডুয়োডেসিমো। প্রথম সংস্করণ ১৫০০ দেড় হাজার ছাপা হইল। মূল্য ॥৵০। গ্রন্থকার ও সত্ত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা— হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর। মন্তব্য—

"This is a poem in which *Sakti* or Force

in its non-phenomenal form, is represented as being far too mysterious to be understood by even the mightiest intellects, and the ten forms of *Sakti* as conceived in the Tantras, are described as implying, in different ways, cruelty, sternness and destruction on the one hand, and knowledge, benevolence, conservation and progress on the other. The idea meant to be illustrated by the poet seems to be the one which would be conveyed by the phrase, the *religion of force*, which, in the opinion of many living Bengali scholars, is the real religion of the Tantras."

বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভা। অক্ষয়চন্দ্র যে অর্থেই বলুন না কেন, 'দশমহাবিদ্যা'য় যথার্থই কবির প্রতিভা বিশ্বব্যাপিনী। 'নবপ্রভা'র জনৈক চিন্তাশীল লেখক একস্থলে লিখিয়াছেন "হেমচন্দ্রের কবিতাতে আমি চারিটি স্তর দেখিতে পাই। ১—ব্যক্তিগত। যথা

'হতাশের আক্ষেপ' ও 'উন্মাদিনী'। ২—স্বদেশগত। যথা 'ভারতসঙ্গীত' ও 'ভারতবিলাপ'। ৩—সমগ্র মানব (দেব দৈত্য) জাতিগত। যথা, 'বৃত্রসংহার।' ৪—অখিল ব্রহ্মাণ্ডগত। যথা 'দশমহাবিদ্যা।' হেমচন্দ্রের কবিতাতে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রতিহত প্রণয় হইতে, বিশাল অপ্রতিহত প্রীতি,—অবিরাম আনন্দপ্রবাহ—যাহা চরাচর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা ক্রমবিকাশে বিকশিত হইয়াছে।" নবপর্য্যায়ের "বঙ্গদর্শনে' উদভ্রান্ত-প্রেমিক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও লিখিয়াছেন, "হেমবাবুর কবিতায় আমরা তাঁহার মানসিক বিকাশের একটি পদ্ধতি দেখিতে পাই। * * প্রথমেই ধর তাঁহার কবিতাবলী। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার দৃষ্টি নিজের ভিতরেই নিবদ্ধ— কোথাও প্রতিভার পরিচয়, কোথাও বিদ্যার পরিচয়। * * যে সময়ে তিনি কবিতাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার প্রতিভা আপনাতেই সম্বদ্ধ। তাহার পর দেখিতে পাই যে, তাঁহার প্রতিভা ইহ সংসারের ব্যাখ্যায় নিযুক্ত। জগতে যে শক্তিরই জয় তাহা ত আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। 'বৃত্রসংহারে' সেই চিত্রই চিত্রিত হইয়াছে। * * *



শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যা

তাহার পর দেখিতে পাই যে হেমবাবুর প্রতিভা সংসারকেও ছাড়াইয়া বিশ্বকে আলিঙ্গন করিয়াছে—তাহার পরিচয় 'দশমহাবিদ্যায়'। প্রতিভার এইরূপ পরিণতি সচরাচর দেখা যায় না।"

কাব্যের অস্পষ্টতা। 'দশমহাবিদ্যা' হেমচন্দ্রের প্রতিভার সর্ব্বোচ্চ বিকাশের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হইলেও কেহ কেহ উহার অংশবিশেষ অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া অনুযোগ করিয়া থাকেন। অক্ষয়চন্দ্র একস্থলে লিখিয়াছেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে 'দশমহাবিদ্যার' দর্শন ভাগ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। * * * দশমহাবিদ্যায় কবির প্রতিভা বিশ্বব্যাপিনী। কিন্তু কেমন করিয়া কোন উপায়ে তিনি বিশ্বধারণ করিলেন, তাহার ধারণা আমাদের কিছুই হয় না। কবিবরের চিতা হইতে এখনও ধূম উদ্গিরিত হইতেছে। সেই ধূমায়মানা চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। দুঃখ করিতেছি। দুঃখ আমাদের জন্য—আমরা বুঝিতে পারি নাই; দুঃখ তাঁহার জন্য তিনি বুঝাইতে পারেন নাই। অথচ হেমচন্দ্রের কবিতা এখনকার কালের কতকগুলি কবিতার মত, এ বৎসরের এই

বর্ষার আকাশের মত, নিয়ত কুহেলী-ভরা নয়। হেম-চন্দ্র বাল্যাবধি ইংরাজিতে অভ্যস্ত। সুতরাং তাঁহার অনেক কবিতায় ইংরাজির ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে ছায়া তাঁহার কাব্যের প্রাঞ্জলতা একেবারে নষ্ট করিতে পারে নাই। তবু যে আমরা দশমহাবিদ্যা বুঝিতে পারিতেছি না—এটা বড়ই দুঃখের বিষয় বৈ আর কি বলিব?"

অক্ষয়চন্দ্রের মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে বিষয় অবলম্বন করিয়া দশমহাবিদ্যা কাব্য রচিত হইয়াছে সেই বিষয়টি একটি ক্ষুদ্র গীতিকাব্যে স্পষ্টতর ভাবে বর্ণিত করা অসম্ভব। আর একটি কথা স্মর্তব্য। হেমচন্দ্র গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।" এই সুমধুর গীতিকাব্য পাঠকালে পাঠকগণ বাসবদত্তার কবি সুবন্ধুর উক্তি হৃদয়ঙ্গম করিবেন—

অবিদিতগুণাপি সুকবের্ভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাং।
অনধিগতপরিমলাপি হি হরতি দৃশং মালতীমালা॥

"সুকবি রচিত পদ, অর্থে তার সুবিশদ
গুণ যদি না হয় গ্রহণ।

তথাপি রচনা তাঁর, অমৃতের ধারাকার,
শ্রবণেতে হয় বরিষণ ॥
মালতী-কুসুম-হার, মধুর সুরভি ভার,
অনুভূত যদিও না হয়।
তথাপি শোভায় তার, বাকী কিবা থাকে আর
বিমোহিত হয় আঁখিদ্বয় ॥"

বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সঞ্জীবচন্দ্রের সমালোচনা।

যাহা হউক, সর্ব্ব-প্রথমে 'দশমহাবিদ্যা'র বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা কর্ত্তব্য। সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিৎ সঞ্জীবচন্দ্র তৎ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' এই অপূর্ব্ব কাব্যের যে সমালোচনা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, আমরা সেই লুপ্তপ্রায় সমালোচনাটি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া কাব্যখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।—

"হেমবাবুর এই অপূর্ব্ব কাব্য বুঝাইবার আগে, সাধারণতঃ কাব্য সম্বন্ধে কয়টী কথা বলিতে হইতেছে।

কাব্য পড়ি কেন? কেহ কেহ বলেন ভাল লাগে বলিয়া,—কেবল আমোদের জন্য। তাঁহাদের মতে কাব্য, সৌন্দর্য্যের ষোলকলা চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিয়া বিমল

আনন্দ বিতরণ করে ; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—তাহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। অন্য এক শ্রেণীর সমালোচকেরা বলেন, উদ্দেশ্যহীন কিছুই এ সংসারে হইতে পারে না। কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য,—সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি ; এবং সেই সৃষ্টি সহায়ে, চিত্তশুদ্ধি বিধান করা কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য। সুতরাং উদ্দেশ্য এবং সফলতার কথা ধরিলে, এ সংসারে কাব্যের ন্যায় মঙ্গল বিধাতা আর কেহ নহে। দেখা গেল, দুই শ্রেণীর কাব্যরসজ্ঞেরাই আসলে এক মত,—কাব্যের প্রাণ যে সৌন্দর্য্য, কেহই ইহা অস্বীকার করেন না। প্রথমোক্ত সমালোচকেরা কিন্তু উদ্দেশ্যের কথা শুনিলে বড় চটিয়া যান। তাঁহারা বুঝেন, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এ সব সাংসারিক কথা। সাংসারিক ক্ষতি লাভ গণনার মধ্যে কাব্য আনিয়া ফেলা ঘোর হৃদয়হীনতার কায। তাঁহারা স্বীকার করেন পবিত্রতার অতিরেকে সৌন্দর্য্য মাত্র তিষ্ঠিতে পারে না—প্রকৃত কাব্য জন্মিতে পারে না। কিন্তু তথাপি পবিত্রতা বা নীতি অথবা সত্য বিশেষ যে কাব্যের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবে সেটা তাঁহাদের অসহ্য।

"কাব্যের উদ্দেশ্য আমোদ, কিন্তু আমোদ কি ? আমোদের পরিণাম কি ? যাত্রার কালুয়া ভুলুয়ার

অশ্লীল আমোদে অন্যে আমোদ পায়,—আপনি বিরক্ত ক্ষুব্ধ হন কেন? অতএব আমোদে পবিত্রতা চাই। আমোদেরও উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি বিধান; আমোদ আমাদিগকে নীচতার পঙ্ক হইতে মহত্ত্বের স্বর্গে উন্নত করে। মনুষ্যের সুখ বৃদ্ধি করিয়া, মনুষ্য জীবন উন্নত করে বলিয়াই আমোদের এত উপযোগিতা এবং এত প্রয়োজন। কাব্যের আমোদ অনর্থক কেন হইবে? ইতিহাস বা বিজ্ঞান, দর্শন বা ব্যবস্থাশাস্ত্র, মনুষ্য জাতির অশেষ উন্নতির পরিপোষক—কাব্য নহে কেন?

"একটু আশঙ্কা হয় বটে যে, চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের বিধান করিতে গেলে কবি নীতি লইয়া বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন। নৈতিকতত্ত্ব প্রতিপাদন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইবে—কাব্য লোপ পাইবে। কবি ও সমালোচকের কার্য্য যে বিভিন্ন এই সমালোচকগণ তাহা ভুলিয়া যান। যাহা সত্য, যাহা নীতি সুতরাং যাহা কোন মহদ্ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, কবি তাহাই কাব্যে পরিণত করেন; কবিতার আত্মায় তাহাই অনুপ্রাণিত করেন। তার পর তাঁহার সমালোচক আসিয়া, সেই সৌন্দর্য্য এবং সেই নীতির বিশ্লেষণ করিয়া কবির অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেন।

"'দশমহাবিদ্যা' বুঝিতে হইলে এই কথা কয়টি মনে রাখিতে হইবে। যে মহাতত্ত্বের ভিত্তিতে এই গীতি কাব্য দাঁড়াইয়াছে, তাহা এক্ষণে evolution বা ক্রম-বিকাশ নামে সুপরিচিত। আমাদের কবি 'বৃত্রসংহার' কাব্যের নানাস্থানে জড়জগতের বিকাশ মাত্র দেখাইয়া-ছিলেন—লাপ্লাস এবং হর্বট স্পেনসরের অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক জড় সৃষ্টিতে তিনি কাব্যের মোহ সিঞ্চন করিয়াছিলেন। উপস্থিত কাব্যে তাঁহার লক্ষ্য জীব-জগতের বিকাশ। সেই বিকাশ শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া তিনি মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন।

"কাব্যের প্রারম্ভে সতীশূন্য কৈলাসের দৃশ্য। সতী-দেহ ছিন্ন হইয়াছে। সতীশোকে কৈলাসপুরী আজ 'অন্ধকার, বিঘোর ভুবন।' কৈলাসের সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য 'সতীমুখ বিভাসিত' আলোক অভাবে মলিন। স্বয়ং বামদেব গভীর শোকে মগ্ন। এই শোকগাম্ভী-র্য্যের পরিমাণ হয় না। কবির নিজভাষায় সে চিত্র দেখান যাইত, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। ক্ষুদ্র কাব্য ;—পাঠক মহাশয় অল্প সময়ে পড়িয়া শেষ করিতে পারিবেন। আর এই কাব্যের আগাগোড়া অনন্ত গম্ভীর কবিতার সারি। উদ্ধৃত করিতে হইলে সবগুলি করিতে হয়।

"সেই শোকগাম্ভীর্য্য হইতে পবিত্রতা আসিয়াছে। যতক্ষণ শোকের বেগ তীব্র উচ্ছ্বাসময়, ততক্ষণ শঙ্করের চক্ষে সতী সেই চিরপরিচিতা সুকুমারতনু গৃহিণী মানবী :—

ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ, স্কন্ধে কভু তুলি হাত
সতীরে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্ব্বার, সুকুমার তনু তাঁর,
মমতার অভ্যাস যেমন ॥

"কিন্তু নারদের অনন্ত গীতি মহিমায় সে মোহাবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে স্থির গাম্ভীর্য্য জন্মিল। তখন বামদেব 'ঈষৎ হাসিতে অধর মণ্ডিত' করিয়া নারদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

অহে ভক্তিমান্, ভ্রান্তিবিলাসে
শিবেরো প্রমাদ ঘটনা।
অনাদ্যারূপিণী ভবপ্রসবিনী
সতীরে মানবী ভাবনা।

"অতঃপর এই কাব্য মধ্যে সতীর মানবীরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। তিনি সর্ব্বত্র সেই 'অনাদ্যা-রূপিণী ভবপ্রসবিনী।' কঠোর নাস্তিক প্রিয়জন বিরহে স্বর্গের অস্তিত্ব অনুভব করেন, কেননা সে স্বর্গ

প্রেম এবং বাসনার সৃষ্টি। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কোমৎ কবিত্বময় মহাধর্ম্মের ভিত্তি পত্তন করিলেন, স্ত্রী জাতিকে আরাধ্যা দেবী বলিয়া সম্মানিত করিলেন। এ পবিত্রতা, এ কবিত্ব, এ মহানুভাবকতার মূলে সেই বাঞ্ছিত-বিচ্ছেদ। ভালবাসাতেই স্বর্গ; তার পৃথিবী স্বর্গ নাই। সুতরাং এই কাব্যের প্রভাতে এই শোক দৃশ্যের বিশেষ প্রয়োজন। নহিলে দশমহাবিদ্যারূপের মাহিমা বুঝা যাইত না। অনেক কথা প্রহেলিকাবৎ বোধ হইত।

"এই কাব্যের নারদ মহানন্দময়; সেই নারদঋষিই বটেন,—কিন্তু পুরাণের সেই কলহপ্রিয় নারদ নহেন। বাহিরে তিনি আনন্দময়, ভিতরে ভিতরে জীব-দুঃখে অনন্ত দুঃখী। মহাদেব যখন সতীশোকে ঘোর মোহাচ্ছন্ন, তখন তিনি অনন্ত জ্ঞানী ঋষি;—অনন্তের মোহময় গীতি বলে শিব-শোকাপনোদনে সযত্ন। কিন্তু সতীশোকে তাঁহারও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল; সতীর মাতৃবৎ স্নেহ স্মরণ করিয়া, সে চরিত্রের অতুলনীয় গৌরব অনুভব করিয়া, গর্ভাগ্নি ভূধরের মত স্থির ছিলেন। শিব যেমন সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন, নারদের শোকপ্রবাহ অমনি ছুটিল। দেখিয়া মহাদেব তাঁহাকে

সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বুঝাইলেন যে সতীর কখন মৃত্যু হইতে পারে না, কেননা তিনিই স্বয়ং আদ্যা-শক্তি।

"নারদ সেই প্রকৃতিরূপিণী প্রাণময়ী সতীমূর্ত্তি দেখিতে চাহিলেন। তখন মহাদেব নিজ দেহ মুক্ত হইয়া অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এমন দৃশ্য বাঙ্গলা কোন কাব্যে আর কখন দেখি নাই। মিলটনও সচ-রাচর দেখাইতে পারেন নাই।

"তখন জড়জগৎ হইতে জীবজগতের প্রথম বিকাশ দেখা গেল। অসংখ্য অমেয় জীবকুল ;—যেমন করিয়াই হউক সকলেরই বাঁচিবার চেষ্টা। বড় ঠেলাঠেলি, মারা-মারি,—অনন্ত জীবনের সংগ্রাম। রোগ, শোক— বিষম বিপত্তির জ্বলন্ত মূর্ত্তি সকল—আপনি আপনি মুহুর্মুহু উছলিয়া উঠিতেছে। সে দেশে মায়া মমতা নাই, সহানুভূতির লেশ মাত্র নাই—কেবল স্বার্থ, কেবল পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভীষণ অত্যাচার! দেখিয়া দেখিয়া নারদ স্তম্ভিত বিষণ্ণ দিশাহারা হইলেন। এ কি! যিনি জগন্মাতা, জীবকুলপালিনী, দয়ার উৎস-রূপিণী—তাঁর কি এই কীর্ত্তি? তাঁর এই রূপ! বিশ্বাস হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অবিশ্বাস

করি কিরূপে? এরূপ তর্কে দার্শনিক স্থির করিয়া বসেন যে ঈশ্বর অপূর্ণ, সসীমশক্তি, নির্ম্মাতা মাত্র, সৃষ্টি-কর্ত্তা নহেন। এ ভ্রম দূর করিবার অধিকার কেবল এক কবির;—তাঁহার আসন যুক্তিময়-জীবন দার্শনিকের বহু উচ্চে। নারদ সেই দার্শনিক, এখানকার কবি মহাদেব। তিনি দেখাইলেন, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৌশলে সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ। সকলই মনুষ্যের কল্পনা-তীত শুভ কামনায় গ্রথিত। প্রত্যক্ষ দেখ, দশমহা-বিদ্যারূপ! ' সেই সতী, অনন্ত প্রকৃতি সকল রূপেরই মধ্যে—অথচ বিকাশ কেমন বৈচিত্র্যময়! তখন নারদ সেই দারুণ নৃশংস জড়মূর্ত্তির চরম বিকাশ দেখিলেন—মনুষ্যহৃদয়ে।

"দশমহাবিদ্যার দশমূর্ত্তিতে মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে। তারামূর্ত্তিতে জ্ঞানের প্রথম বিকাশ। তার পর কবি অন্যান্য মূর্ত্তিতে উত্তরোত্তর প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি কমনীয় গুণরাজির সমাবেশ কল্পনা করিয়া, শেষে মহালক্ষ্মীরূপে সর্ব্বজীবে দয়াভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অক্ষরে অক্ষরে যিনি এই বিকাশ শৃঙ্খল মিলাইয়া দেখিতে চান, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা সহজ নহে; এবং কবির তাহা

উদ্দেশ্যও নহে। আমাদের বিশ্বাস, দশমহাবিদ্যার প্রকৃত গৌরব অনুভূত হইতে দিন লাগিবে। সুতরাং এক অর্থে এই গীতিকাব্য বর্ত্তমান সময়ের ঠিক উপযোগী নহে।"

'বান্ধবে'র সমালোচনা। পৌরাণিক বর্ণনার সহিত পার্থক্য। সন ১২৮৯ সালের নবম সংখ্যা "বান্ধবে" "দশমহাবিদ্যা"'র একটি বিস্তৃততর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বোধ হয় স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় উহার লেখক ছিলেন। এই সমালোচনাটী 'দশমহাবিদ্যা'র নূতন সংস্করণগুলির শেষ ভাগে পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ মুদ্রিত হইত। অক্ষয়চন্দ্র এই সমালোচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণে 'দশমহাবিদ্যা' প্রকাশিত হয়। সেই সালের পৌষ সংখ্যায় 'বান্ধবে' দশমহাবিদ্যার চব্বিশ পৃষ্ঠাব্যাপিনী সমালোচনা দেখা দেয়।

"এই সুদীর্ঘ সমালোচনা, কবিবরের অনুমত্যনুসারে (হয় ত অনুরোধে) দশমহাবিদ্যার পরিশিষ্টরূপে পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। সমালোচক দশমুখে দশমহাবিদ্যার প্রশংসা করিয়াছেন। এক মাস কাল মধ্যে

দশমহাবিদ্যার ভূয়ো প্রচার না হওয়ায়, বঙ্গসমাজের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। আর দশমহাবিদ্যার দর্শন কবিত্ব কতরকম করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই। যথা— ভৈরবীকে কেন ভক্তি-বিধায়িনী বলিয়া বর্ণনা করা হইল? ধূমাবতী কেন শ্রমহারিণী? মাতঙ্গী কেন প্রীতিদায়িনী? বগলা কেন দারিদ্র্যদলনী।

"সমালোচক আরও বলিতেছেন, 'জ্ঞানময়ী তারাকে লম্বোদরা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত লম্বোদরতার কি সম্পর্ক? কিম্বা জ্ঞানের সহিত পিঙ্গল বর্ণের কি সম্বন্ধ? যিনি স্নেহময়ী (ভুবনেশ্বরী) তাঁহার হস্তে অঙ্কুশ * * * প্রভৃতি কেন? ভক্তি বিধায়িনী ভৈরবীর * * * স্তন রক্তলেপিত কেন? যদি হেম বাবু পৌরাণিকী বর্ণনা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত বিবাদ করিতাম না, কিন্তু যখন তিনি মধ্যে মধ্যে কবিসুলভ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মূর্ত্তিগুলির রূপে ও চরিত্রে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিলেই ভাল হইত।' সৌভাগ্যবানের ত এই সমালোচনা;—তবু দশটি বিদ্যার ছয়টী বুঝিতে তিনি অক্ষম। ইত্যাদি।"

কবিবরের অনুরোধে যে সমালোচনাটি প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল, অক্ষয়চন্দ্রের এ অনুমান কতদূর সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না। দশমহাবিদ্যা প্রকাশকালে হেমচন্দ্র বাঙ্গলা কাব্যাকাশের প্রদীপ্ত ভাস্কর; তাঁহার প্রতিভাজ্যোতিঃ বা তাঁহার কাব্যের অলোকসামান্য দীপ্তি দেখাইবার জন্য অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত মফঃস্বলের কোনও মাসিক পত্রের সমালোচনারূপ প্রদীপের প্রয়োজন ছিল বলিয়া অনুভূত হয় না। বিশেষতঃ অক্ষয়চন্দ্রের মতে যে সৌভাগ্যবান সমালোচক কাব্যখানির অধিকাংশই বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার সমালোচনাটি কবিবর হেমচন্দ্র কেন প্রকাশকগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পুনর্মুদ্রিত করাইবেন তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ অক্ষয়চন্দ্র প্রদর্শন করেন নাই।

হেমচন্দ্র দশমহাবিদ্যার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—"দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যে তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।" কিন্তু আখ্যানাদির অনুসরণ না করিলেও মহাবিদ্যার

রূপ বর্ণনায় হেমচন্দ্র যথাসম্ভব শাস্ত্রোক্ত বর্ণনার সহিত উহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বান্ধবের' সমালোচক ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এবং 'কালী কৈবল্যদায়িনী'তে বর্ণিত দশমহাবিদ্যার রূপবর্ণনার সহিত হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যার রূপবর্ণনার তুলনা করিয়াছেন। তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার ধ্যানাদির সহিত তুলনা করিলে প্রতীয়মান হয়, হেমচন্দ্রের বর্ণনা শাস্ত্রোক্ত বর্ণনা হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। তারাকে কেন হেমচন্দ্র পিঙ্গলবর্ণা ও লম্বোদরা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও প্রতীত হয়। আমরা নিম্নে তন্ত্রসারধৃত তারার ধ্যান এবং হেমচন্দ্রের তারার রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ তুলনা করিয়া দেখুন—.

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ।
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্।
খড়্গাকর্ত্তৃ সমাযুক্ত সব্যেতরভুজদ্বয়াম্।
কপালোৎপলসংযুক্তসব্যপাণিযুগান্বিতাম্।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্।

বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রয়ভূষিতাম্।
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
সাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম।
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্॥

(তন্ত্রসার)

ভীমা লম্বোদরা ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরা
খর্ব্ব আকৃতি বামা নৃমুণ্ডমালিনী।
জটা বিভূষণা পিঙ্গল বরণা
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী॥
খড়্গ কর্ত্তরী করে কপাল উৎপল ধরে,
রক্তিম রবিচ্ছবি দৃশ্য ত্রিনয়নে।
জ্বলন্ত চিতামাঝে পদ্মে দ্বিপদ সাজে,
লোল রসনা বামা ঘোর হাসি বদনে॥
জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীবহৃদয় ভরি
বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে॥

অবশ্য তন্ত্রোক্ত ধ্যানগুলিতে কেন দেবীর বিশিষ্ট বর্ণ ও বিশিষ্ট আকৃতি কল্পিত হইয়াছে তাহা এস্থলে আলোচিত হইতে পারে না।

অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্যশিষ্য এবং তন্ত্রশাস্ত্রে

হেমচন্দ্র

সুপণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি অক্ষয়চন্দ্রের 'কবি হেমচন্দ্র' নামক ক্ষুদ্র ৮৩ পৃষ্ঠা-ব্যাপী পুস্তিকাখানির অশেষ প্রশংসা করিয়া দীর্ঘ ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, তিনিও বলিয়াছিলেন—"দশমহাবিদ্যার কথা লইয়া আমরা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বিতণ্ডায় মাতিব না। বস্তুতঃ হেমচন্দ্র দশমহাবিদ্যার ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আমি শাস্ত্রিকতা অথবা চলিত মতের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই। দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণনায় সকল তন্ত্রও এক মত নহেন। নানা তন্ত্রে নানা ভাবে দশমহাবিদ্যার চিত্র সকল অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং সে পক্ষ ধরিয়াও হেমচন্দ্রকে দোষ দেওয়া চলে না। কাব্যের হিসাবে দশমহাবিদ্যা বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব সামগ্রী; বড় মধুর, বড় সুন্দর, বড়ই প্রগাঢ়। ঠিক ডারবিনতত্ত্বের মাপকাঠিতে উহাকে মাপিলে চলিবে না, ইভোলিউশন থিওরী ধরিয়া ষোল আনা বুঝিবার চেষ্টা করিলে স্থানে স্থানে বাধা পাইতে হইবে সত্য; কারণ, উহা কেবল ডারবিন তত্ত্ব নহে, কেবল তন্ত্র নহে। লেসিঙের লেওকুন যেমন ভাবোন্মেষ, তেমনই একটা ভাবের দ্বারা ধরিয়া উহাতে স্ত্রীত্বের—

মাতৃত্বের উন্মেষ-স্তর-বিন্যাস দেখান হইয়াছে। সে তত্ত্বের ব্যাখ্যার এখনও সময় আইসে নাই, সে তত্ত্ব বুঝিবার আগ্রহও এখনও বাঙ্গালার কাব্যামোদিগণের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। কাজেই সে কথা লইয়া আলোচনা বা বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই।"

ভূদেব বাবুর উপদেশ। ঋষিকল্প মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর বলেন যে, একবার হেমবাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে হেমচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার বাবাই আমার জীবনের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত সংসর্গে এবং তাঁহার ফরমাইসেই 'ভারতসঙ্গীত' এবং 'ভারতবিলাপ'।" হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যাও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে রচিত। সম্প্রতি মুকুন্দদেব বাবু আমাদিগকে হেমচন্দ্র ও ভূদেববাবুর কয়েকখানি পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে দশমহাবিদ্যার দর্শনভাগ—যাহা অক্ষয়চন্দ্র কুহেলীভরা এবং অর্থহীন বলিয়া উড়াইয়া

দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ভূদেববাবুর অনুমোদিত এবং অনেকাংশ তাঁহার উপদেশে রচিত। কাব্যখানির শেষ ভাগে হেমচন্দ্র উমার শিশুক্রোড়ে জগজ্জননীরূপে আবির্ভূত হইবার চিত্র অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ভূদেব তাঁহাকে যে কারণে সতীকে শিবের পার্শ্বে হরগৌরীরূপে দেখাইতে উপদেশ প্রদান করেন তাহাও এই পত্রাবলী হইতে প্রতীত হয়। পত্র-গুলি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। মুকুন্দবাবু উহার যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১)

খিদিরপুর

৯ই নভেম্বর ১৮৮২

মহাশয়

আপনার প্রস্তাবিত কথা মত আমি কাব্যটী এক-রূপে শেষ করিয়াছি। শেষাংশটি আপনার কিরূপ লাগিবে তাহা জানি না। সে যাহা হউক প্রথমাং-শটি যাহা আপনার ভাল লাগিয়াছিল ইহার দ্বারাই তাহা আমি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব। সাধারণে কবিতাটি কিরূপভাবে গ্রহণ করিবে—তাহার সম্বন্ধে আমি কিছুই

নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না এবং ঈর্ষাপরায়ণতা ও অনুপলব্ধি প্রযুক্ত সমালোচনার যন্ত্রণা যাহা আমায় সহ্য করিতে হইবে—সে বিষয়ে আমার ভয় হইতেছে। কিন্তু এসব নৈরাশ্য, হতাশা, ও প্রত্যাহত আত্মগৌরবের সময় আপনার অনুমোদনলাভই আমার একমাত্র আনন্দের বিষয় থাকিবে। আপনার সম্বন্ধে সুখ্যাতির কথা বলিতে যাওয়া আমার সাজে না, কিন্তু একথা না বলিলে নয় যে—কবিতাটির পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে আপনার সুন্দর পরামর্শটী আমাকে আপনার নিকট চিরবাধিত করিয়াছে। আপনার পরামর্শের সারবত্তা এবং আপনার ওজস্বী ও সমভাবে সহানুভূতিপূর্ণ ধীশক্তি সম্বন্ধে আমি অনেক কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু চুপ করিলাম।

আর একটি প্রার্থনা। উমার এরূপ একটি ধ্যান লিখিয়া দিতে পারেন কি যাহাতে তাঁহার স্নেহবত্তা সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণের পরিচয় থাকিবে, রুদ্র কিছুই থাকিবে না। ধ্যানটি যেন উমার শিশুক্রোড়ে জগৎজননী রূপে আবির্ভাবের উপযুক্ত হয়। যদি অনুগ্রহ করিয়া এইটি দেন—তো বড়ই বাধিত হই।—সত্যকার তান্ত্রিক আমি যতদূর দেখিয়াছি এক আপনাকেই দেখি-

য়াছি। কাছারি খুলিবার পূর্ব্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আগামী সপ্তাহে কবে আপনি বাড়ীতে থাকিবেন ও আপনার অবসর থাকিবে লিখিবেন।

অনুগত

হেম।

(উপরি উদ্ধৃত পত্রের উত্তর)

প্রিয় হেমবাবু,

তোমার স্নেহপূর্ণ ও সম্মান সূচক পত্রের প্রত্যুত্তরে মাতৃক্রোড়ে শিশুরূপ মানব সমষ্টির চিত্র (হিউম্যানিটী) সম্বন্ধে কোম্‌টের ধারণার বিষয় প্রথমে আমার কিছু লিখিবার আছে। এ ধারণাটী অতীব সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উৎপত্তি কোথায়, এবং ইহাতে সত্যই বা কতদূর? মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল ও টিসিয়েন্ প্রত্যেকে আপনাদের উদ্ভাবনী শক্তি অনুযায়ী যে মাতৃমূর্ত্তির (ম্যাডোনা মূর্ত্তি) অমর চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্পষ্টতই তাহা হইতে সংগৃহীত। এই চিত্রকরেরা কোথা হইতে এ শক্তি লাভ করিলেন? খ্রীষ্টধর্ম্মের পৌরাণিক কথা হইতে। খ্রীষ্টধর্ম্মের উদ্ভব কোথায়? ইহুদীদিগকে পুরুষানুক্রমে যে সকল

ক্ষমতাপন্ন প্রতিবেশী জাতিদিগের অধীনে থাকিতে হইয়াছিল সেই সকল জাতির দ্বৈত উপাসনার ফলে সংঘটিত ভ্রান্ত মত সংযুক্ত জুডাইজম্ হইতেই অধিকাংশে বোধ হয়! ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য ধারণা, যাহা সেণ্ট পল্ তাঁহার নিম্নলিখিত উজ্জ্বল মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, "যাঁহাতে আমরা বিচরণ করি, জীবিত আছি এবং যাঁহার সত্তায় আমাদের সত্ত্ব" জুডাইজমে সে ধারণার সম্পূর্ণ অভাব এবং সেই জন্য খ্রীষ্টধর্ম্মেও ইহার অত্যধিক অভাব আছে। মোট কথা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ইউরোপীয় আর্য্য-দিগের মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে অগ্রসর জাতিদিগের দ্বারায় গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও ইহুদিধর্ম্মের যে মলের সহিত ইহার উৎপত্তি সে মল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। এরূপ অবস্থায় মাতৃমূর্ত্তি (ম্যাডোনা মূর্ত্তি) মানবজাতি বাচক বলিয়া ধরিতে গেলে স্বতঃই অপরিপূর্ণ। যদি কোমট্ ভারতে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি অধিকতর পরিসর গ্রহণ করিত এবং তিনি তাঁহার পূজার লক্ষ্য মানবজাতিকে বিশ্ব প্রকৃতির সহিত একই করিতেন বলিয়াই মনে হয়। আরও একটু দেখ। মানবচিত্র যেরূপ কোমট্ ধারণা করিয়াছেন তাহা কি নির্দ্দেশ করিতেছে? শিশু

ক্রোড়ে এক যুবতী মূর্ত্তি। দেখিতেই পাইতেছ যে ইহাতে দুইটি মূর্ত্তি আছে—মাতা ও সন্তান। এই মাতা কে? প্রকৃতি। এই সন্তান কে? মানব। আমার বোধ হয় কোমট্ কোথাও এই ব্যাখ্যা দেখাইয়া দেন নাই। তবে এ দ্বৈতবোধ কিসের জন্য। এ দ্বৈত-চিত্রের জড় ও চৈতন্যের সহিত কোনও দূর সম্পর্ক আছে কি? কোমট্ কিন্তু তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। জড় ও চৈতন্যের সুসঙ্গত ধারণায় তাহারা 'সমকালীয়', মাতা ও সন্তানের ন্যায় একের পূর্ব্বস্থানীয় অপর নহে। যেখানে তন্ত্রে অদ্বৈত ধারণা হইতে দ্বৈত ধারণার অবতারণা করা হইয়াছে সেখানে এইরূপ ধারণাই আছে। তন্ত্রে জড় ও চিতের ধারণা—মাতা ও সন্তান—পুরোবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী—স্রষ্টা ও সৃষ্ট রূপে করা হয় নাই; ভর্ত্তা ও ভার্য্যা, পরিধি ও অন্তর্ব্বর্ত্তী ক্ষেত্র, দুইটী সমবর্ত্তী বস্তু রূপেই ধারণা করা হইয়াছে। তাহার চিত্র এইরূপ—

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াং
অন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥

এ মূর্ত্তির চিন্তন কর। এ মূর্ত্তি অদ্ভুতভাবে অতীন্দ্রিয়। তোমার মনে হইবে যে তুমি ঈশ্বরী (চিৎস্বরূপিণী) কে দেখিতেছ, কিন্তু বাস্তবিক তুমি কেবল তাঁহার পরিচ্ছদ, তাঁহার অলঙ্কার, তাঁহার ভাবভঙ্গী মাত্র দেখিতেছ; এবং তাঁহার জগৎ প্রেমও দেখিতে পাও; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পাও না। তুমি গতিশীল ও ক্রিয়াশীল যাহা যথার্থতঃ দেখিতে পাও তাহা সেই জড় অংশ। উপরিউক্ত ধ্যানটি অন্নপূর্ণার ধ্যান। কিন্তু এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি যাহা দ্বৈত অধিকারীর সুবিধার জন্য —ইহা আদি মূর্ত্তি নহে—এই (তারা পরিবার) সমষ্টির প্রথম মূর্ত্তি ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি; তাঁহার প্রতিরূপে দ্বৈত নাই—অদ্বৈত। ধ্যান নিম্নলিখিত রূপ—

উদ্যদ্দিনদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং
তুঙ্গকুচং নয়নত্রয়যুক্তাম্।
বরদাঙ্কুশপাশ ভীতিকরাং
স্মেরমূর্ত্তিং প্রভজে ভুবনেশীং॥

ইহাতে একটি মাত্র মূর্ত্তি আছে এবং ইহাতে জড়কে চিৎ হইতে পৃথক করিয়া দেখান হয় নাই বলিয়া তুমি ঈশ্বরীর স্বরূপ দেখিতে পাইতেছ। তাঁহার তুঙ্গকুচযুগ, তাঁহার ত্রিনেত্র, তাঁহার ভীতিকর অস্ত্রধারী ও বরাভয়

যুক্ত হস্ত সকল ও স্মিতমুখ দেখিতে পাইতেছ। হিন্দু ধর্ম্মের অনুশীলনে একটি বিষয় ভুলিলে চলিবে না। ইহার নিরঞ্জন অদ্বৈতবাদ (যোগিজম্)। যাহা একেশ্বর-বাদ (মনোথিজম্) নহে—নিখুঁত ও নিরঞ্জন অদ্বৈতবাদ ইহার সার্ব্বকালিক দৃঢ় ধারণা—শুধু বিশ্বাস নহে যে এই ব্যষ্টি জগৎ বিশ্বাত্মায় অবস্থিত—(সর্ব্ব প্রত্যেকে আছেন)। বহুদিন হইতেই আমি দেখিয়াছি এবং বাস্তবিক আমাকে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছিল যে হিন্দুধর্ম্ম বুঝিবার, উহার ভিতরে ঢুকিবার ইহাই প্রকৃত চাবির স্থানীয় এবং আজ পর্য্যন্ত এই চাবিটী আমার নিকট তন্ত্র ও পুরাণের গুপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যায় অপারগ হয় নাই। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম—ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিতে অদ্বৈত চিত্র এবং অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে দ্বৈত চিত্র উভয়ই পূর্ণসৃষ্টির চিত্র। গণপতির নিম্নলিখিত ধ্যানে আমরা সৃষ্টি কালীন মূর্ত্তি পাইয়া থাকি—

নবরত্নময়ং দ্বীপং স্মরেদিক্ষুরসাম্বুধৌ।
তদ্বীচি ধৌত পর্য্যন্তং মন্দমারুত সেবিতং॥
মন্দার পারিজাতাদি কল্পবৃক্ষলতাফুলং।
উদ্ভূত রত্নছায়াভিররুণীকৃত ভূতলং॥

উদ্যদ্দিনকরেন্দুভ্যাং উদ্ভাসিতদিগন্তরং।
তস্ত মধ্যে পারিজাতং নবরত্নময়ং স্মরেৎ॥
ঋতুভিঃ সেবিতং ষড়্‌ভিরনিশং প্রীতিবর্দ্ধনৈঃ
তস্যাধস্ত মহাপীঠে রচিতে মাতৃকাম্বুজে।
ষট্‌কোণান্তস্ত্রিকোণস্থং মহাগণপতিং স্মরেৎ।
হস্তীন্দ্রাননমিন্দুচূড়মরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রং রসা-
দাশ্লিষ্টং প্রিয়য়া সপদ্মকরয়া স্বাঙ্কস্থয়া সন্ততম্॥

তুমি জান যে গণপতি গণেশ = ব্রহ্মা = প্রাণ (শক্তি) কাযেই দেখিতেছ আমরা এখনও প্রকৃতির কথাই বলিতেছি এবং প্রকৃতির যে অংশকে মানব সমষ্টি* বলা হয় এবং যাহাকে কোমট্‌বাদীরা পূজার বিষয় করিতে চান, এখনও তাহার কাছে আসে নাই। অবতার উপাসনায় মানবে ঈশ্বরোপাসনা পাওয়া যায়। নিম্ন-লিখিত ধ্যানে আমরা সন্তানের কথা পাই :—

ফুল্লেন্দীবরকান্তিবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

নিম্নলিখিত কথাগুলির ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আব-শ্যাক কিনা বলিতে পারি না।

গো—পৃথিবী ; গোপ গোপী—পৃথিবীর রক্ষণশীল শক্তিপুঞ্জ।

তার পরের ধ্যানটীতে আমরা মানবের সাক্ষাৎ পাই।

উত্তপ্তহেমসঙ্কাশাং লক্ষ্মীং বামোরুসংস্থিতাং।
নানালঙ্কারসুভগাং শুক্লবাসাযুগাবৃতাম্।
সঁহাসাং লীলয়া দেবীং মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাশাঙ্কুশধনুঃশরান্।
ধারয়ন্তং জগন্নাথং রক্তপদ্মারুণেক্ষণম্॥

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে মনুষ্যরূপী ঈশ্বরের কথা বলিবার সময়ও হিন্দু ঈশ্বরবাদ স্ত্রী, পুরুষ জড় চৈতন্য রূপ সমকালিক দ্বৈতের কথাই আনয়ন করেন। কোম্‌ট ও খ্রীষ্টধর্ম্মীয় পরকালিক দ্বৈতের অবতারণা করেন না। আমি আবার বলিতেছি, হিন্দু চিন্তাশীলতা অদ্বৈত ধারণায় শিক্ষিত হওয়াই ইহার কারণ।

আরও দেখা যাউক। অনন্তের অচিন্তনীয় রাজত্ব ছাড়িয়া কালের নিম্নস্তরে আসা যাউক। জ্ঞানের চর্চ্চার কথা ছাড়িয়া, কামনার বিষয় বিবেচনা করা যাউক। এই উপবিদ্যাদিগের স্তরে বনদুর্গা, সুর সুন্দরী—প্রভৃতি অনেক সুন্দর ও মনোরম মূর্ত্তি সকল

ও উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী, কপালমালিনী প্রভৃতি ভয়াবহ ও ভীষণ (hideous) (যদি এইরূপই বলিতে ইচ্ছা কর) চিত্র সকলের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু এসব বিষয়ে অধিক কথা বলা আবশ্যক মনে করি না। গণেশজননী, যিনি সর্ব্বকামফলপ্রদারূপে উপবিদ্যাগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানীয় তাঁহার ধ্যান নিম্নে দিতেছি। ইনি মহাবিদ্যা নহেন, পরাজ্ঞান ও মুক্তি দান ইহাঁর কার্য্য নহে, কিন্তু তথাপি ইনি কোম্‌টের সমগ্র মানব ধারণার বিশেষ সন্নিকটবর্ত্তিনী।

তাঁহার স্বরূপ এই—

ধ্যায়েদ্ বরাননাং দেবীং লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।
বিম্বোষ্ঠাং চারুদশনাং হাস্যযুতাভয়প্রদাম্॥
নানালঙ্কারসংযুক্তাং দ্বিভুজাং নীলচেলিকাম্।
ক্রোড়স্থিত গণেশেন পীতস্তুত পয়োধরাম্॥
গৌরবর্ণাং ক্ষীণমধ্যাং রত্নপীঠোপরিস্থিতাম্।
গণেশজননী দুর্গাং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্॥

আমার বোধ হয় অত্যন্ত খুঁৎখুঁতে আধুনিকেরও ইহার সম্বন্ধে আপত্তির কিছু থাকিবে না। যীশু-মাতা মেরীর মত অবশ্য তিনি শিশুকে লইয়া দণ্ডায়মান

নহেন। শিশু তাঁহার অঙ্কে স্থিত আর শিশুকে তিনি স্তনদান করিতেছেন, কেবল সম্মুখে উপস্থিত মাত্রই করিয়া নহেন। মাতা ও সন্তান—ইহাতে কাল ও পর্য্যায় (একের পর অন্য)—রহিয়াছে। তাঁহার সুন্দর দন্তপংক্তি সুন্দর ওষ্ঠদ্বয় এবং তাঁহার মুখে মাতৃস্নেহপূর্ণ স্মিত হাস্য—যে মাতৃস্নেহ বিশ্বজীবনের সহায়তাকারী—এগুলির প্রতি দৃষ্টি কর, তুমি দেখিতে পাইবে যে ভারতবর্ষে ইটালীর মত চিত্রকরগণ ছিলেন না বলিয়াই গণেশজননীর মূর্ত্তি ম্যাডোনা মূর্ত্তির মত সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয় নাই। কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু আর একটি বাধা আছে —"ত্রিনয়না।" হিন্দু যে সকল মূর্ত্তিতেই মহতী প্রকৃতির উপাসনা করিতেছে, সর্ব্বরূপেই সেই বিশ্ব মহানের পূজা, একথা যে হিন্দু কিছুতেই ভুলিতে পারে না—ঐ ত্রিনয়ন তাহারই নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু এই ত্রিনেত্র, ইহা সত্যই সুন্দর নহে কি? অবশ্য স্ত্রীজাতির ত্রিনয়ন নাই, কিন্তু নাসিকার মূলভাগে কজ্জলটিপে তাহারা ইহারই অনুকরণ করে না কি?—ত্রিনয়ন কোন মতে অসামঞ্জস্যকর নহে।

স্নেহপূর্ণ
ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

(২)

খিদিরপুর

১৮।১১।১৮৮২

মহাশয়

আপনার শেষপত্রে আমার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইলাম। পত্রখানি অমূল্য এবং অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির একান্তই চিত্তাকর্ষক হইবে। আমার উপরে ইহা অত্যুজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে এবং আমার মনে বড়ই ক্ষোভের উদ্রেক করিয়াছে যে আমি আপনার নিকট-প্রতিবেশী নই এবং আপনার হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গভীর জ্ঞানের পূর্ণ ফললাভের সুযোগ পাইতেছি না। আমি সামাজিক বিষয়ে এবং কোম্‌টের দর্শন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই; কিন্তু যাহা জানি তাহাতেই আপনার কথা বুঝিতে পারিয়াছি। ঐ বিষয় সম্বন্ধে বন্ধুবর যোগেন্দ্র বিশেষজ্ঞ; পত্রখানি তাঁহাকেও দেখাইলাম এবং দিলাম। আমার কাব্যখানি সম্বন্ধে আমি বিশেষ উপকার পাইয়াছি। সতীকেই বিশিষ্টরূপে শিবের পার্শ্বে দেখান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন—হরগৌরীরূপে—তাহাই করিলাম। সন্তান ক্রোড়ে জননীরূপে

দেখাইলাম না। কৈলাসে জগৎসৃষ্টির সহিত এই মূর্ত্তির আবির্ভাবই দেখাইয়াছি।

আমি কাব্যখানির পাণ্ডুলিপি প্রকাশকদিগকে দিয়াছি। আমাদের ইংরাজ মনিবদিগের নববর্ষের প্রথম দিনে আপনাকে একখণ্ড পাঠাইতে পারিব। কাব্যটীর শেষাংশ লইয়া একদিন আপনার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটে নাই। চিঠির উত্তর লিখিতে দেরী হইয়া গিয়াছে।

আপনার স্নেহাস্পদ

হেম।

ভূদেব বাবুর ব্যাখ্যা। পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রাবলী পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে দশমহাবিদ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য ভূদেব বাবুই সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন। যদি তাঁহার ব্যাখ্যা পাওয়া যাইত তাহা হইলে উহার অর্থ যেরূপ সুস্পষ্ট হইত, আর কিছুতেই সেরূপ হইত না। 'দশমহাবিদ্যা' প্রকাশের পর ভূদেব বাবু সন ১২৮৯ সালে ১৫ই পৌষ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' উহার এক বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত সমালোচনার পূর্ব্বার্দ্ধ মাত্র আমরা মুকুন্দ বাবুর সৌজন্যে

প্রাপ্ত হইয়াছি, উত্তরার্দ্ধ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। উক্ত সমালোচনাটি আমাদের বিবেচনায় এত মূল্যবান যে, উহার পূর্ব্বাংশ মাত্র—অসম্পূর্ণ হইলেও—নিম্নে উদ্ধার করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।—

"কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'দশমহাবিদ্যা' নামক একখানি অতি উপাদেয় অভিনব কাব্যগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। কবিবর ইহার গীতি-কাব্য নাম দিয়া ইহাতে ছন্দোবন্ধের বহুবিধ পারিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা বঙ্গ পদ্যে নূতন নূতন ছন্দের ছটা দেখিতে চান, তাঁহারা এই কাব্যগ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অতীব তৃপ্ত হইবেন। হেম বাবুর ভাষা যে মিষ্ট এবং মধু-যে মিষ্ট একথা বলিবার অপেক্ষা করে না।

"আমরা এই কাব্যগ্রন্থে অপর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতেছি। প্রকৃত কবিশক্তিসম্পন্ন বিশুদ্ধমনা ব্যক্তিরা যে উন্নত জ্ঞানপথে স্বতঃই উত্থিত হইতে পারেন, এই গ্রন্থখানি সেই কথারই একটি দেদীপ্যমান প্রমাণ স্বরূপে আমাদিগের চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। পাঠক একটু মনোযোগ করিয়া শুনুন, হেমচন্দ্র তাঁহার এই গীতিকাব্যে কি কথা বলিতেছেন—শিবমোহিনী সতী

নিজ দেহত্যাগ করিলে মহাদেব যেরূপ বিরহ-বিহ্বল হইয়াছিলেন এবং সমস্ত কৈলাস যেরূপ শোকবিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তাহা সুন্দররূপে প্রায় মানুষভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। শিব কাঁদিতেছেন—

রে সতি রে সতি, কান্দিল পশুপতি, পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ মগন হর, তাপস যতদিন, ততদিন না ছিল ক্লেশ॥
শবহৃদি আসন, শ্মশান বিচরণ, জগত-নিরূপণ জ্ঞানে!

*　　　*　　　*

সেহ যোগ-সাধন কি হেতু ঘুচাইলি ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমাপিলি, সে সাধ এতদিন পরে

"এমন সময়ে মহাঋষি নারদ বীণাবাদন সহকারে গান করিতে করিতে শিবের সমীপস্থ হইলেন। নারদ পদার্থটি কি তাহা পাঠক এই সময় হইতেই বুঝিয়া লউন। নারদ শব্দের অর্থ মোক্ষ *। অতএব নারদ শিব সম্বাদরূপ এই কাব্যে মোক্ষের সহিত মঙ্গলময় ঈশ্বরের সম্বন্ধ বর্ণিত হইতেছে বুঝিতে হইবে। মোক্ষ জ্ঞানের ফল; জ্ঞান ভূতবিষয়ক, বুদ্ধিবৃত্তিবিষয়ক এবং ধর্ম্মবিষয়ক সমস্ত তথ্যের সারভূত। কবি ভৌতিক

* নরাণাং ইদং নারং—নরসম্বন্ধীয়ং সুখ দুঃখাদি তৎ দ্যতি খণ্ডয়তি যঃ স নারদঃ। দো য চ্ছেদে ধাতুঃ।

গূঢ়তথ্য প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন সে সৃষ্টি আচ্ছাদন অপসারিত হইলে—

মহাকাশ পরকাশ বিশ্বশূন্য ভুবনে।
শূন্যময় ব্যোমগর্ভ শ্যাম অভ্রবরণে।

"পৃথিবী এবং সূর্য্য ত নাই-ই; নক্ষত্রমালাও নাই এবং পৃথিবীর ও সূর্য্যের সমসূত্রপাতে যে মেষ এবং তুলা নামক রাশি চক্রের দুইটি রাশি কল্পিত হয়, সে দুইটির স্থান পর্য্যন্ত নাই, অথবা পৃথিবীর নারদ এবং ঈশান মূর্ত্তি শিব সেই দুই স্থানে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া আছেন—অপর সমুদায় মহাকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মহাকাশের দশদিক পূর্ণ করিয়া একা অনাদ্যা মহাশক্তি বিরাজ করিতেছেন।

"জ্ঞানানন্দময় নারদ মহাশক্তির স্বরূপ বোধে উন্মুখ হইয়া বলিতেছেন—

কুতূহলে বিকলিত পরাণ উতলা।
হেরিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা॥

"কিন্তু শক্তির স্বরূপ বোধ জীবের সাধ্যাতীত। কবি এই তথ্য মহাদেবের মুখে ব্যক্ত করিলেন।

বুঝিতে নিগূঢ় তত্ত্ব শিব ব্যর্থ বাসনা।
সে রহস্য বুঝিবারে কেন চিত্তে কামনা॥

নারিবে হেরিতে সর্ব্ব হেরিবে যা সেখানে।
মনোব্যথা পাবে বৃথা ও ভুবন সন্ধানে॥
ভয়ঙ্করী মায়ালীলা অসহ সে সহনে।
বিধি বিষ্ণু পরাজিত নাহি সহে কল্পনে॥

"কিন্তু নারদের কৌতূহল তৃপ্ত হইল না। কেন হইবে? এটি জানিবার নয়, জানিতে পারা যায় না, কোন প্রশ্নেরই এরূপ উত্তর পাইলে মন নিবৃত্ত হইতে পারে না, ক্ষোভের উদয় হয় মাত্র। নারদের তাহাই হইল। তিনি বলিলেন—

পাবনা কি সতীনাথ সৎস্বরূপা হেরিতে?
ভক্তিমালা পায়ে দিয়ে জগদম্বা পূজিতে?
হে হর শঙ্কর, পুরিল না বাসনা।
নারদের বৃথা জন্ম বৃথা ধর্ম্ম যাপনা।

"মহাদেব নারদকে রিপুপরতন্ত্র শরীরী জীবের অবস্থা প্রদর্শন করিলেন—

"প্রতি জনে জনে তার ছাঁদে ছাঁদে গুরুভার,
নাগপাশ নানা ফাঁসে গলদেশে পরেছে।
বিবিধ শৃঙ্খল হার কর পদে বেঁধেছে॥

"ইহাদের দুঃখ দেখিয়া নারদের দয়ার উদ্রেক হইল। এতক্ষণ যে জ্ঞানপিপাসা মাত্র তাঁহাকে উদ্রিক্ত করিতে-

ছিল তাহার তেজঃ দয়ার মধুরভাবে নিমগ্ন হইল। নারদ প্রার্থনা করিলেন—

দয়াময়! হর তবে সেই সব বন্ধনী।
মানবের পীড়া যায় সদা দিবারজনী॥
হর তবে তাহাদের দেহরূপ পিঞ্জরে,
মণি শিখা বাঁধা যাহে ধরা হেন বিবরে।

"ইহার পর মহাদেব নারদকে একবার চকিতের ন্যায় শক্তির লীলা দেখাইলেন। এই ঘটনাটি সমস্তই উদ্ধৃত না করিলে কবির গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা যায় না। যতদূর পারা যায় চেষ্টা করা যাইতেছে। মহাদেবের আজ্ঞায় নারদ একবার শক্তির ক্রীড়াভুবনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন।—

দেব ঋষিবর আদ্যাশক্তিলীলা দেখিতে তুলিলা আঁখি।
পলক না পড়ে স্থির নেত্রতারা ক্ষণমাত্র শূন্যে দেখি॥
বিশ্ব অন্ধকার দেখে তপোধন দৃষ্টিহারা চক্ষু দহে।
দুরন্ত কিরণে কাতর নারদ অন্ধের যাতনা সহে।

"জগতে শক্তির লীলা দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে নারদ পরমজ্ঞানীকেও অন্ধীভূত হইতে হয় তাহার সন্দেহ কি? বিশুদ্ধ শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই কিন্তু সে বিশুদ্ধ শক্তির—স্বরূপ একান্ত অপরিজ্ঞেয়। তাহার পর—

বুঝি মহেশ্বর ইঙ্গিতে তখন, ললাট বিস্ফার করি।
সে বিষম তেজ রাখিলেন নিজ ললাটলোচনে ধরি ॥
নিস্তেজ যখন সে ঘোর কিরণ, নারদে কহেন হর।
অই দেখ ঋষি অনাদি ভূবনে শক্তিলীলা নিরন্তর ॥

"কবি এই স্থলে যেরূপ অদ্ভুত রসের আনয়ন করিয়াছেন সে বিষয়ে আমরা কোন কথাই বলিতেছি না। প্রকৃত তথ্য এবং শাস্ত্রার্থ কেমন প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। তন্ত্র শাস্ত্রের মতে শক্তি চিৎ এবং শিব জড়। কবি দেখাইলেন যে বিশুদ্ধ শক্তি—অর্থাৎ জড়ও যে শক্তির অন্তর্নিবিষ্ট তাহা মনুষ্যবুদ্ধির একান্ত অতীত। জড়পদার্থে শক্তির সমাবেশ হইয়া গেলেই মনুষ্যবুদ্ধি শক্তির প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারে মাত্র; তাহাতে শোকসন্তাপ এবং বিস্ময় ভিন্ন কিছুমাত্র সুখের অনুভব হয় না।

অভয় হৃদয়ে হেরিলা নারদ
শিবের চক্ষু লভি।
দেখিলা শূন্যেতে দুলিছে সঘনে
ভীষণ ব্রহ্মাণ্ডচ্ছবি ॥
তাম্রবর্ণ যথা দিবাকর কায়া
ডুবিলে রাহুর গ্রাসে।

দেখিতে তেমতি সে ভীম ব্রহ্মাণ্ড
অঙ্গে আভা পরকাশে ॥
রুধিরের ধারা চারিধারে বহে
বসুধারা যেন ধায়।
সে ঘোর জগৎ জীবে নিরখিলে
হৃদয় শুকায়ে যায় ॥
বহিছে উচ্ছ্বাস সে জগত পুরি
অম্বর বিদার করি।
প্রলয়ের ঝড় বহে যেন দূরে
অরণ্য নিশ্বাসে ভরি !
কিম্বা যেন হয় লক্ষ তূরী নাদ
পূরিয়া শোকের তানে
তেমতি প্রচণ্ড দারুণ উচ্ছ্বাস
নিনাদে ঋষির কাণে।
দয়াময় ঋষি নিদারুণ ধ্বনি
শ্রবণে বিষাদ প্রাণে।
মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়ে শিব পদে
জীববৃন্দ শোক গানে।

"বিশুদ্ধ শক্তির প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় মনুষ্য হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয় তাহা দেখাইয়া তাহারই অংশস্বরূপ কালশক্তি কালীর ব্রহ্মাণ্ড কি ভাব ধারণ করে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

মহাঋষি নিরখিলা কালিকার জগতী।
মহাশূন্যে ঘুরিতেছে ভয়ঙ্কর মুরতি ॥
দলমল টলমল আপনার ভ্রমণে।
দুলে যেন চক্রনেমি অতি দ্রুত গমনে ॥
হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পনা।
ধূমকেতু ভীমগতি নহে তার তুলনা ॥
আপনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপরি।
স্রোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী ॥
সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে।
কৃমি কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে ॥
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্ম যত সেখানে।
ঘোররূপা মহাকালী গ্রাসে মুখ ব্যাদানে ॥
অঙ্গ হতে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
করালবদনা কালী নৃত্য করে হুঙ্কারে ॥
ঘুরে ঘুরে শূন্যদেশে বিশ্বকায়া ফিরিল।
বিভীষণ চিত্র এক নেত্রপথে ধরিল ॥
অন্তহীন হিমরাশি হিমালয় আকারে
ধবলের চূড়া যেন ধ ধ করে তুষারে।
নিরখিল মহাঋষি বিথারিত নয়নে।
প্রলয়ের ঘোর বহ্নি হিমদহে দহনে ॥
খণ্ড হয়ে হিমরাশি চণ্ডমূর্ত্তি ধরিয়া,
ভীম শব্দে পড়িতেছে মহাশূন্যে খসিয়া ॥

ব্রহ্মাণ্ডের লয় যেন কালান্তের নিনাদে।
বিশ্বকেন্দ্রে বিশ্বনাথ পুরী কাঁপে শবদে॥
প্রতিধ্বনি ঘনঘোর মহাকাশে ছুটিল।
দশদিকে দশ বিশ্ব ঘন ঘন দুলিল॥

"ইহার পর নিতান্ত কালকবলাধীন এই পৃথিবীতে কালশক্তির লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

হেনকালে সুবিচল মহাঋষি নিরখিল
কালরূপিণী চণ্ডী কালিকার ভুবনে—
বিখণ্ডিত নরদেহ পড়ে পচা শব সহ
রুধিরে মুষলধারা, ধারা যেন শ্রাবণে।
জনমিছে পুনঃ তায় পশু পক্ষী নরকায়,
সংগ্রামে পুনরায় এ উহারে বধিছে।"

'দশমহাবিদ্যা'র ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটি গল্প। 'দশমহাবিদ্যা' ভূদেব বাবুর উপদেশানুসারে লিখিত সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যায় কবির অভিপ্রায় সম্পূর্ণ রূপে অবগত হইতে পারা যাইত। এই ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করা সম্ভব হইল না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু পাঠকগণ সকলেই কাব্যখানি পাঠ করিয়া অনায়াসে নিজ নিজ বুদ্ধি ও মানসিক প্রবণতা অনুসারে উহার মনোমত ব্যাখ্যা করিয়া লইতে পারেন—কোনও সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে উহার অর্থ সীমাবদ্ধ করিবার

প্রয়োজন নাই। অনেক সময়ে কবি কোনও কোনও পদ বিশেষ কিছু ভাবিয়া না লিখিলেও পাঠক তাহার সুন্দর ব্যাখ্যা করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী নিম্নে বিবৃত হইল।

একবার হেমচন্দ্র গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে তাঁহার বৈবাহিক যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার সেখানে যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে গোয়াড়ীর এক কৃতবিদ্য যুবক যদুবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে সতী বিয়োগের পর কৈলাসের বর্ণনা করিতে গিয়া হেমবাবু কেন লিখিলেন "কেবল করে উল্লাস— নীলকণ্ঠ-কণ্ঠের গরল ?"

যদু বাবু এই প্রশ্নে মহাবিব্রত হইয়া পড়িলেন। পরে একটু ভাবিয়া বলিলেন যে, "এরূপ লেখার কারণ আছে। গরল জানিত যে তাহাকে পান করিয়া কেহ জীবিত থাকিতে পারে না—তথাপি এতদিন সে নীলকণ্ঠের কিছুই করিতে পারে নাই কারণ সতীর বৈধব্য হওয়া সম্ভবপর নহে। সে আজ দেখিল যে সতী নাই, এইবার মহাদেবকে নিশ্চয় নাশ করিব এই ভাবিয়া এত উল্লাস করিতেছিল।" হেম বাবুর নিকট যদুবাবু এই গল্প করেন। তিনি উত্তরে বলেন যে আপনি সুন্দর অর্থ

করিয়াছেন, কিন্তু আমি বিশেষ কিছু ভাবিয়া লিখি নাই। গরলের স্বভাবই কুটিল—সেই জন্য লিখিয়াছিলাম।"

ইংরাজী প্রভাব। হেমচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন যে তিনি বাল্যাবধি ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কাব্যের অনেকস্থলে ইংরাজী গ্রন্থকারদিগের ভাব সঙ্কলন লক্ষিত হইবে। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র যথার্থই লিখিয়াছেন, "কবি হেমচন্দ্র সত্য সত্যই সরস্বতীর বরপুত্র। সরস্বতীর, বঙ্গ সরস্বতীর বরে, কৃপায়, তিনি পরস্বকে নিজস্ব অর্থাৎ হেমস্ব করিতে পারিতেন। সেই হেমস্ব তিনি আমাদিগকে দান করিয়াছেন। আমরা এখন অধিকারী হইয়া সেইগুলি আমাদেরই নিজস্ব মনে করিতেছি, তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ হইতেছি, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পরস্বকে নিজস্ব করাই হেম বাবুর একটি কৃতিত্ব।"

হেমচন্দ্র কিরূপে পরস্বকে হেমস্ব করিতে পারিতেন তাহার একটি উদাহরণ এস্থলে দিতেছি। 'দশমহাবিদ্যায়' আছে—

ধ্যান মগ্ন ভোলানাথ, স্কন্ধে কভু তুলি হাত
সতীরে করেন অন্বেষণ,
পরশিতে পুনর্ব্বার, সুকুমার তনু তাঁর
মমতার অভ্যাস যেমন।

তখন নয়ন ঝরে পূর্ব্বকথা মনে সরে
সরে যথা নদী প্রস্রবণ।

উহার সহিত জগদ্বিখ্যাত কবি টেনিসনের "In Memoriam"এর নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির তুলনা করুন—

Tears of the widower, when he sees
A late-lost form that sleep reveals,
And moves his doubtful arms, and feels
Her place is empty, fall like these;
Which weep a loss for ever new,
A void where heart on heart reposed,
And, where warm hands have prest and closed,
Silence, till I be silent too.

দেখিতে পাইবেন ইংরাজ কবির ভাব সঙ্কলন করিয়াও প্রতিভাশালী হিন্দু কবি কিরূপে জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়াছেন।

নূতন সুর। 'দশমহাবিদ্যা'য় কবি বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন সুর আনিয়াছেন। ইহাতে নূতন নূতন রাগিণীর অবতারণা করিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্রও ইহার "বড়ই করুণ অথচ গম্ভীর, সরল অথচ মর্ম্মভেদী" সুরের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন "রে

সতি রে সতি” ইত্যাদি পদের “সুরটুকু হেমচন্দ্রের নিজস্ব। বৈষ্ণব কবিতে বাঁশরীর সুর মাখান আছে, কিন্তু মহাদেবের এ শোকে শৃঙ্গরব নাই। ভারতের গড়ানিয়া টৌড়ীতে নাই। বিত্থার কাঁদুনি গীতি—মহাদেবের ক্রন্দনে গর্জ্জন। ‘রে সতি রে সতি’ এই ছয় অক্ষরেই মহাদেবের সমস্ত বিলাপ। রতি বা বিত্থা কত কথাই না বলিয়াছেন। অবলম্বন বিভিন্ন, প্রকরণ বিভিন্ন। কাজেই পরিণামও ভিন্ন। এই ক্রন্দনের নূতন রাগিণীও হেমচন্দ্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।” .

‘দশমহাবিদ্যা’র নূতন ছন্দ অনেকের আবৃত্তির আয়ত্ত নহে। হেমচন্দ্রের ‘জুনিয়র’—এক্ষণে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বলেন “যে যথাযথভাবে দশমহাবিদ্যার আবৃত্তি করিতে না পারিলে হেমচন্দ্রের অসহ্য হইত। কাহাকেও দশমহাবিদ্যা পড়িতে দেখিলে তিনি তাহার হস্ত হইতে পুস্তক খানি কাড়িয়া লইয়া স্বয়ং সুর করিয়া পড়িতেন। তাঁহার আবৃত্তির প্রণালীতে যেন উহার অর্থও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত।”

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সন ১২৮৯ সালে ২৩শে পৌষ তারিখে পূর্ব্ববঙ্গের বিত্থাসাগর রায় কালীপ্রসন্ন



শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী।

ঘোষ মহাশয়কে একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"দশমহাবিদ্যার কিয়দংশ হস্তলিপি হইতে হেমবাবুর মুখেই শুনিয়াছিলাম। সেটুকু আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। বোধ হয় সেটুকু আপনিও গ্রন্থকারের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। অবশিষ্টাংশ এখনও ভাল করিয়া পড়ি নাই। যেটুকু পড়িলাম তাহাতে বুঝিলাম যে গ্রন্থকারের মুখে না শুনিলে গ্রন্থের সকল রসটুকু পাওয়া যায় না। বিশেষ তাঁহার ছন্দ নূতন—আমার আবৃত্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। এজন্য স্থির করিয়াছি যদি কখন রজনী প্রভাত হয়, তবে তাঁহারই মুখে অবশিষ্টাংশ শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিব।"

'দশমহাবিদ্যা'র ভাষা। 'দশমহাবিদ্যার' ভাষা সম্বন্ধে 'বান্ধবের' সমালোচক লিখিয়াছেন—"হেমবাবুর ভাষা অনেকস্থলে ভাবের প্রতিধ্বনি বলিয়া অনুভূত হয়। নারদ বীণা বাদন করিতেছেন, বীণা কখনও বা পঞ্চমে নামিতেছে, কখনও বা সপ্তমে উঠি-

তেছে ! যখন নারদ বীণা পঞ্চমে নামাইতেছেন, তখন কবির ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমে নামিতেছে যথা—

মৃদু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্ফুরণে।
সরিৎ প্রবাহিল সুন্দর বাদনে ॥
রুণু রুণু নিক্কণ কোমলে মিলিয়া।

"আবার নারদের বীণা যখন সপ্তমে উঠিতেছে তখন কবির ভাষাও সেই সঙ্গে সপ্তম তানের অনুকরণ করিতেছে—

ক্রমে গুরু গর্জ্জন সপ্তমে ছুটিয়া।

"যখন আনন্দের কথা বলা হইতেছে তখন কবির ভাষাতেও যেন সেই আনন্দের প্রতিধ্বনি হইতেছে—

আনন্দে তরুকুল মঞ্জরি হাসিল।
আনন্দে তরুডাল বিহঙ্গে সাজিল ॥

"যখন কোথাও ধীর গতির বর্ণনা করা হইতেছে, তখন কবির ভাষাতেও সে ধীর গতির ভঙ্গিমা দেখা যাইতেছে।

মৃদুহাসি রঞ্জিল মহাদেব বদনে।
বিচলিত কৈলাস মৃদু মৃদু চলনে ॥
ধীর মৃদুল গতি কৈলাস চলিল।
মধ্যগগন ভাগে শিবপুরী বসিল ॥

"এই কয় পংক্তি পড়িলে মনে হয় যেন কৈলাসপর্ব্বত ধীরে ধীরে তোমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে।

"আবার যখন ভয়ানক বা বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে, তখন হেমবাবুর ভাষার মধ্যেও সেই ভয়ানক ও বীভৎসত্বের ছায়া পড়িয়াছে।

শুক্তি শম্বুক শাঁখ, মুখব্যাদান ফাঁক,
রক্ত জল বিদেহ লেহি লেহি চলিছে।
পন্নগ সুভীষণ ফণা প্রসারণ
উৎকট গর্জ্জন তরঙ্গে দুলিছে॥
কূর্ম্ম কমঠি কূট উর্ম্মিতে লটপট
লোহিত তৃষাতুর সংপুট খুলিছে॥

"এইরূপে আরও বহুতর স্থলে ভাষার উৎকর্ষ দেখা যাইতে পারিবে।"

'আন্তরীক্ষ' কবি। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন একস্থানে লিখিয়াছেন "বৃত্রসংহার, ছায়াময়ী, ও দশমহাবিদ্যা এই তিনখানি পুস্তক পাঠ করিয়া হেমবাবুকে আন্তরীক্ষ কবি বলিতে আমাদের ইচ্ছা হইতেছে। কারণ দেখা যাইতেছে যে তিনি পার্থিব পদার্থ অপেক্ষা অন্তরীক্ষস্থিত পদার্থের বর্ণন করিতে অধিক ভালবাসেন, স্বর্গ, সুরপুরী, সুমেরু, বিদ্যুৎ, বজ্র, গ্রহগণ, নক্ষত্রমণ্ডল



পণ্ডিত ৺রামগতি ন্যায়রত্ন

রাশিচক্রস্থান প্রভৃতির বর্ণনা করা এবং তন্মধ্যে কল্পনা-প্রসূত নানাবিধ নিগূঢ় তাৎপর্য্যের স্থাপন ও ব্যাখ্যা করা তাহার নিদর্শন।"

বাস্তবিক দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সর্ব্বত্রই হেমচন্দ্রের কল্পনা-বিহঙ্গের গতি অব্যাহত, কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের ন্যায় তিনি সর্ব্বদাই

True to the kindred points of heaven
and home.

অথবা কবি কাব্যান্তরে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন—

যাইনি নিমেষ পল
ছাড়িয়া এ ধরাতল।
তবুও ভ্রমিনু স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।

অলৌকিক ঘটনার আলোচনা করিতে করিতেও হেমচন্দ্র কখনও ইহলৌকিক কথা বিস্মৃত হন নাই, অতি-মানবের আলোচনা প্রসঙ্গেও মানবের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের অবতারণা করিতে ভুলেন নাই—মানবের জীবন সমস্যার আলোচনা করিতে বিস্মৃত হন নাই। আমরা এইদিক্ হইতেও তাঁহার কাব্যখানি দেখিব।

জীবনসমস্যার আলোচনা। বাঙ্গলা-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ৺নিত্যকৃষ্ণ বসু মহাশয় ১৩০৫ সালের "সাহিত্যে" 'কাব্যকথা' শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভে লিখিয়াছেন, "ইংরাজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিক স্কট সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও সমালোচক কার্লাইল বলিয়াছেন—There is nothing spiritual in him ; all is material, of the earth, earthy. He does not wrestle with the great mystery of existence. In his heart there was no gospel tidings burning to be uttered. মানবের এই রহস্যপূর্ণ জীবনসমস্যার কথা যাঁহার হৃদয় মনকে আন্দোলিত করিতে পারে না, কার্লাইল তাঁহাকে কবি-শ্রেণীর মধ্যে উচ্চাসন দিতে প্রস্তুত নহেন। বাস্তবিক যিনি দুর্লভ কবি প্রতিভার অধিকারী হইয়া কেবল 'বসন্তভূষিতা বসুন্ধরা' আর 'সেই মুখখানি' লইয়া কালাতিপাত করেন, তিনি যে স্বীয় শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেছেন না, ইহা সুসমালোচক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

কার্লাইলের এই উচ্চ আদর্শ লইয়া বিচার করিয়া নিত্যকৃষ্ণ বসু মহাশয় বলেন, "বিদ্যাপতি হইতে ভারত-



৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

চন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রাচীন কবিকুল আমাদিগকে এ বিষয়ে বড় বেশী সাহায্য করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব কবিদল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয় থাকিলেও, মুকুন্দ-রাম ও ভারতচন্দ্র যে অনেকস্থলেই অবিমিশ্র জড়তায় পরিপূর্ণ এ বিষয়ে বোধ হয় সকলেই আমাদের কথায় সায় দিবেন। আর বৈষ্ণব কবিদিগের প্রতি অনুরাগের আধিক্যবশতঃ আমরা তাঁহাদের জড়ভাগ উপেক্ষা করিলেও, কার্লাইল বোধ হয় তাঁহাদের কবিতায় ইন্দ্রিয়বৃত্তিরই অধিকতর বিকাশ দেখিতে পাইতেন। তাঁহা-দের রচনার ভিতর অনেক স্থলে চুম্বন ও পরিরম্ভণের এত ছড়াছড়ি যে ঘোরতর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাবাদীকেও পরাজয় মানিতে হয়। * * * *

"প্রাচীনের দল ছাড়িয়া দিয়া আধুনিক যুগের অগ্রণী বঙ্গের কাব্যবীর মধুসূদনেও কার্লাইল প্রোক্ত আধ্যা-ত্মিকতার কোনও সম্বন্ধ পাই না। * * বঙ্গের প্রিয় কবি তাঁহার বীরাঙ্গনা নির্ব্বাচনে যে দুই একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরা তাহার কোনও প্রকার মার্জ্জনা দেখিতে পাই না। বীরাঙ্গনা বর্ণিত তারা বা অহল্যার চরিত্র কবির অনবধানতার ফল বলিয়া ধরিয়া লইলেও উহারা তাঁহার পবিত্র কাব্যের

দুরপনেয় কলঙ্ক। কামুকতার পরিণাম না দেখাইয়া কেবল উহার সাফল্য মাত্র বর্ণনা করিলে কাব্যের উদ্দেশ্য একবারে বিফল হইয়া যায়।"

নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে নিত্যকৃষ্ণ বলেন—"ইনি প্রথম জীবনে যৌবনবৃত্তি লইয়া এত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ইঁহার লেখনী মুখে যৌবন ও ভোগের কথা ছাড়া আর কোনও কথাই বড় একটা শুনা যাইত না। তৎপরে ইনি 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'রঙ্গমতী' কাব্যে দেশের দুর্দ্দশায় কাঁদিয়া বীণাপাণির চরণে পূর্ব্বকৃত অপরাধ ভঞ্জনের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি ইঁহার লেখনী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের বরাবর এই আশা ছিল যে, নবীন বাবুর নবীন কাব্যত্রয়ে * মানবের জীবনগত বিবিধ সমস্যার এক সুসঙ্গত ও সমীচীন মীমাংসা দেখিতে পাইব। কিন্তু কবি ইহাদের ভিতর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, বিশ্বাস ও যুক্তিমূলক এত বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বের সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাহাদের একটা সুশৃঙ্খল সমন্বয় করিতে পারা যায় না। আমরা কথাটা কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত

* রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস।

হইলাম। পাঠকবর্গ যদি ইহার প্রমাণ দেখিতে চান, তবে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের সমালোচনা পাঠ করিবেন। * * মূল গ্রন্থত্রয়ের আলোচনা করিয়া এবং পাঁড়ে মহাশয়ের সমালোচনা দেখিয়া, নবীন বাবুর শেষ বয়সের সাহিত্য-সন্তানগুলি যে কোনও কালে লোকানুরাগ উপার্জ্জন করিতে পারিবে সে বিষয়ে আমাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।"

হেমচন্দ্র সম্বন্ধে নিত্যকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিবর হেমচন্দ্রের হৃদয়ই আধুনিক যুগের এই জীবন সমস্যার আবর্ত্তে সর্ব্ব প্রথম উদ্বেলিত হইয়া উঠে। হেমচন্দ্রের প্রথম বয়সের 'চিন্তাতরঙ্গিনী' হইতে তাঁহার শেষ বয়সের 'দশমহাবিদ্যা' পর্য্যন্ত ইহার পরিচয়স্থল। এতদ্ভিন্ন বহুতর খণ্ড কবিতাতেও ইহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার জীবন-মরীচিকা, গঙ্গার মূর্ত্তি প্রভৃতি উল্লিখিত হইতে পারে।"

বাস্তবিক যে সকল গভীর তত্ত্ব সৃষ্টির উন্মেষ হইতে মানবকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে, যাহার মীমাংসা করিতে কত শত গভীর দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম্মবেত্তা প্রয়াস পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, হেম-

চন্দ্রের হৃদয়ও সেই সকল ভাবে আলোড়িত হইয়াছিল এবং সেই ভাবনিচয়ের ছায়া তাঁহার কাব্যে ইতস্ততঃ প্রতিফলিত হইয়াছে। যথা—

কেন ভগবান হেন পৃথিবী রচিল।
কলুষ পাথারে পরে কেন ডুবাইল॥
মাটির শিকলে কেন আত্মা মন বাঁধা।
আলো আঁধারিয়া করি কেন দেন ধাঁধা॥
মনে হয় ভেদ করি দেহের পিঞ্জর।
বিভুপাশে গিয়ে যোড় করি দুই কর॥
সুধাই এ নরলোক সৃজন কারণ। ইত্যাদি
(চিন্তাতরঙ্গিনী)

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে।

* * * *

কত যুবা যৌবনেতে, চড়ি আশা বিমানেতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা আভা রে।
তুলিবে কীর্ত্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গল ঘট
প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজা রে॥

* * * *

কালের করাল স্রোতে, ভাসে যবে জীবনেতে,
এই সব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে।
(কবিতাবলী)

কি হেতু হইল সৃষ্টি, সৃষ্টি কি প্রকারে
পঞ্চভূত, আত্মা, মনঃ প্রকৃতি প্রথমা,
পরমাণু, পরমায়ু, উৎপত্তি, বিনাশ,
কাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি সংস্থাপনা।

পুরুষ প্রকৃতি ভেদ হৈল কিবা হেতু,
হইল বা কতকাল, কিরূপ সে ভেদ,
ছিল কিম্বা নাহি ছিল সে ভেদ আদিতে,
হইবে কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ।

কতকাল কোন্ বিশ্ব বিরাজে কি ভাবে,
সৃষ্টির প্রারম্ভে মূর্ত্তি স্থিতি কি প্রকার;
কেন বা জগৎ গর্ভে সকলি অস্থায়ী,
সদা পরিবর্ত্তশীল জড় কি চেতন।

কিরূপে অণুর সৃষ্টি, জীবের অঙ্কুর,
হইল আদি মুহূর্ত্তে, বিনাশন যবে
কোথায় কি ভাবে রবে পরমাণুকুল;
জীবাত্মা অনিত্য কিবা নিত্য চিরদিন।

এই বিশ্ব সুপ্রত্যক্ষ—এ সৌর জগৎ—
বর্ত্তমান কতকাল থাকিবে এ আর;
নরদেহধারী প্রাণী মনুজ আখ্যাত
ধরিবে কি মূর্ত্তি পুনঃ কল্পান্তর পরে।

পাপ পুণ্য কিসে হয়, দুষ্কৃতি সুকৃতি,
অদৃষ্ট-অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে ;
সুখ হৈতে মানবের দুঃখ পরিমাণ
গুরুতর কেন এত জগতী মণ্ডলে।

অন্য জীব-আত্মা আর নরের আত্মায়
কি ভেদ, কি ভেদ দেব মানব-সন্তানে,
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ, মুক্তি বা নির্ব্বাণ,
দেবতা মানব, দৈত্য ভিতরে কি ভেদ।

(বৃত্রসংহার)

বল কোথা বল কোথা পরকাল,
কি প্রথা সেখানে ভোগে কি জঞ্জাল,
জীবদেহ হতে কৃতান্ত করাল
জীবাত্মা যখন খেদায় দূরে ?

কে বলিবে—কে জানাবে—দেখাবে আমায়
বিধাতার সেই পথি, নরের চরম গতি,
পরলোক, মুক্তিপথ, কিরূপ কোথায়। (ছায়াময়ী)

'দশমহাবিদ্যা'তেও কবি প্রশ্ন করিতেছেন—

সুখ কি জীবিতমানে ? কিবা অর্থ নির্ব্বাণে ?
কা হতে জনমিল জগতের যাতনা ?
অশুভ সৃজন কার ? নিরমল বিধাতার
মানস হতে কি এ মলিনতা রচনা ?"

'দশমহাবিদ্যা'র অন্য একস্থানে কবি এই প্রশ্নই স্বতন্ত্র ভাষায় উত্থাপিত করিয়াছেন।

উৎকট ইহলীলা তাঁহারে কি সম্ভবে?
সতী কি অশিব, শিব! আসিছেন এ ভবে?
জীবদুঃখ তবে কি গো অনাদ্যারি রচনা?
অদম্য তবে কি দেব পরাণীর যাতনা?
জগৎ সৃজন লীলা দুঃখ দিতে প্রাণীরে?
না জানি কি ধর্ম্ম তবে ধর দেবশরীরে!

"বান্ধবে"র সমালোচক বলেন, "'অশুভ সৃজন কার? এই প্রশ্নটিকে দশমহাবিদ্যার মূল ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই প্রশ্নটির উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত 'দশমহাবিদ্যা' দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অগ্রে প্রশ্নটি কিরূপ গুরুতর তাহার মীমাংসা করা যাউক, পরে ইহার উত্তর কি তাহারও নির্দ্ধারণ করা যাইবে।

"অশুভ সৃজন কার? তুমি আমি সকলেই কেহ বা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, কেহ বা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আপনাকে আপনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। উদ্যমশীল সাহসী যুবক সংসারের কুটিল স্রোতে এক একটী সৎপ্রবৃত্তি, এক

একটি সদাশা বিসর্জ্জন দেয়, আর কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে 'অশুভ সৃজন কার?' সদনুষ্ঠায়ী সদনুষ্ঠানের চারিদিকে সহস্র সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে, 'অশুভ সৃজন কার?' ধার্ম্মিক সহস্র সহস্র চেষ্টাতেও ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করতঃ কাঁদিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'অশুভ সৃজন কার?' বিধবা মাতা প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে অধীরা হইয়া কাঁদিতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করে, 'অশুভ সৃজন কার?' আর যিনি জ্ঞানী, তিনিও পরদুঃখে বিকলিত চিত্ত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করেন, 'অশুভ সৃজন কার?'

"আমরা সকলে যে শুদ্ধ আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা নহে। আমরা সকলেই এই প্রশ্নের একরূপ না একরূপ উত্তর দিতেছি। কেহ বলিতেছি, 'অশুভ সংসার নিয়ম।' কেহ বলিতেছি, 'অশুভ ঈশ্বর-লীলা।' কেহ বলিতেছি, অশুভ শয়তানের বা আহ্রিমাণের দুষ্টতার ফল। কেহ বলিতেছি অশুভ গ্রহবৈগুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়। দেখা যাউক দশমহাবিদ্যা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেয়।

"কবি বলিতেছেন—

না হও নিরাশ অরে ভক্তিমান
ভূতেশ কহেন নারদে।
দুঃখেরি কারণ নহে জীবলীলা
মোচন আছে রে আপদে॥
পূর্ণ সুখ ইহ জগত ভাণ্ডারে
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে॥
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশ পুরী
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা।
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন
এমনি বিধানে যোজনা।
পর পর পর এদেশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে
অনন্ত জীবিত মণ্ডলী॥

"অর্থাৎ এই যে দুঃখরাশি অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় চারিদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে, দেখিতেছ, এ অশুভ চিরদিন থাকিবে না। এক একটি করিয়া বিবর্তের স্বাভাবিক নিয়মে এই অশুভ মালার নিরাকরণ হইতে থাকিবে। শোক, দুঃখ, তাপ প্রভৃতি নানাবিধ মনঃপীড়া এক একটি করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইবে। এবং

সর্ব্বশেষে এই দুঃখময় জগতেই মনুষ্য পূর্ণ সুখ দেখিতে পাইবে। যে কবি আশার এই মোহন স্বরে পাঠক-দিগকে বিমোহিত করেন, তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা শোক-পীড়িত, দুঃখাহত বা তাপদিগ্ধ তাঁহারাও এই সান্ত্বনাময় কাব্যের গ্রন্থকারকে একান্তচিত্তে আদর করিবেন সন্দেহ নাই।

"কবি যে শুদ্ধ আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি আমাদের গন্তব্য পথেরও নির্দ্ধারিণ করিয়াছেন। চরম শুভ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

লক্ষ্য করি তারি পথ, চালা নিজ মনোরথ
জীবজন্মে ভয় কিরে? জগদম্বা জননী।

"অর্থাৎ 'মাভৈঃ! মাভৈঃ! আকাশে বিদ্যুৎ ক্রূর হাস্য করিতেছে, করুক; ভীত হইও না। শরীরে অগণিত বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতেছে হউক; তাহাতে বিচলিত হইও না। যাহাদিগকে লইয়া তোমার সংসার বিপণি সাজাইয়াছিলে, তাহারা কোথায় গেল, আর ফিরিল না; হউক, তাহাতেও বিষণ্ণ হইও না। সেই চরম শুভের পথ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। জগদম্বা এখানে তোমাকে বিবিধ তাড়না দিতেছেন,

দিউন, তাহার জন্য বিলাপ করিও না। কারণ ইহা নিশ্চিত জানিও জগন্ময়ী জগন্মাতা অনতিবিলম্বে তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তোমার সর্ব্বদুঃখ হরণ করিবেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার দুঃখে, শোকে এই জপমালা স্মরণ করিতে পারিবে, দুঃখ শোকে তাহার কিছুই কষ্ট হইবে না! কবিও একস্থলে ইহার আভাস দিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন—

হের দশরূপ (দশরূপা দশমহাবিদ্যা)
ভবার্ণবে পাবে কূল।

"আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কবি আরও একস্থলে বলিয়াছেন—

ধরম ধরম পর আপন ক্রিয়া কর,
সংযত করি মন, তাহাদেরি নিয়মে।

"অর্থাৎ যে যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছ, সে সেই কর্ম্ম অনুসারে আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর। তুমি তোমার কার্য্য কর। জগতের দুঃখরাশি দেখিয়া হতাশ বা নিরাশ্বাস হইও না। সদা 'সত্যপথে রাখি মন' নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর।

"পূর্ব্বোক্ত সকল কথাগুলি একত্রিত করিলে হেম বাবুর দশমহাবিদ্যায় কি শিক্ষা করা যায়? হেমবাবু

বলেন, 'মনুষ্য দুঃখে শোকে অভিভূত হইও না। বর্ত্তমান অশুভ চিরস্থায়ী নহে। ঈশ্বরকৃপায় এ অশুভ নিরাকৃত হইয়া ইহারই স্থলে শুভ আসিবে। যাহাতে চরম শুভ জগতে আসিতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। বর্ত্তমান সময়ে সত্যপথে থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য অনুসারে আপন আপন জীবন নিয়মিত কর। ভগবদ্‌গীতাতেও এই শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

'সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥'

"অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয় প্রভৃতির বিচার এখানে করিও না। যুদ্ধ এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করিলে তোমায় প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে না। হেম বাবুর শিক্ষা বর্ত্তমান বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পরাধীন দেশে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই নৈরাশ্যের অন্ধকূপে ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকে। রুদ্ধবেগ নদীর ন্যায় পরাধীন ব্যক্তির হৃদ্‌গত যাবতীয় আশা হৃদয়েই পর্য্যবসিত হয়। নৈরাশ্যপ্রবণ পরাধীন দেশে যিনি হেমবাবুর ন্যায় আশার সঞ্জীবন সঙ্গীত শ্রবণ

করান, তিনি নীতি ও সুখ উভয়েরই পথ পরিষ্কৃত করেন। এ স্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে, যে কবি ভারতবিলাপ ও ভারতসঙ্গীত লিখিয়া আমাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার উদ্দীপনা করিয়াছিলেন, সেই কবিই 'দশমহাবিদ্যা' লিখিয়া আমাদের নৈরাশ্যের দমন করিতেছেন। সংক্ষেপতঃ লাভালাভ বিবেচনায় আমরা হেমবাবুর দশমহাবিদ্যাকে উত্তম শ্রেণী ভুক্ত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহি। আমাদের বিশ্বাস যে দশমহাবিদ্যা পাঠে ভারতবাসীর নীতি ও সুখ উভয়ই পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইবে।

"কবি কহিতেছেন, অশুভ ক্রমে ক্রমে নিরাকৃত হইয়া অশুভস্থলে শুভ আসিবে। কিন্তু একথায় প্রমাণ কি? প্রমাণ ইতিহাসে। পৃথিবীতে কিরূপে অল্পে অল্পে সভ্যতার বিকাশ হইতেছে, তাহা কবি বিশেষ দক্ষতার সহিত আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। কবির বর্ণনা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপে অল্পে অল্পে অশুভ স্থলে শুভ আনীত হইতেছে। কবি বলিতেছেন যে, সংসার পটের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাইবে মনুষ্য মনুষ্যকে আত্মরক্ষার্থ বিনাশ করিতেছে। সে অঙ্কের মূলমন্ত্র সংহার। সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী

নরমুণ্ডমালে বিভূষিত হইয়া অহরহঃ নরবিনাশ করিতেছেন! সেখানে যাহা কিছু শিব, যাহা কিছু শান্ত, তাহাই দেবী-পদদলিত হইতেছে। সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী বিভীষণা, রক্তবদনা, উলঙ্গা, লোহিতনয়না, কৃষ্ণবর্ণা।

"আবার সংসার পটের দ্বিতীয় অঙ্কে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, তথায় অশুভ কিঞ্চিৎ নিরাকৃত হইয়াছে। দেখিবে, তথায় সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হইতেছে। প্রকৃতিরূপা দেবী সেখানেও ভীমা, নৃমুণ্ডমালিনী, লোলরসনা অট্টহাসিনী। কিন্তু এ অঙ্কে দেবী উলঙ্গিনী নহেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় সংসারের চতুর্দ্দিকে এখনও চিতা জ্বলিতেছে। কিন্তু ঐ চিতার মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্মও দেখা যাইতেছে; দেবী অসভ্য মনুষ্যের মনে এই প্রথম জ্ঞানের অঙ্কুর প্ররোপিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্য পূর্ব্বে পর্ব্বতগহ্বরে, বৃক্ষ কোটরে বা ভূগর্ভে বাস করিত। এক্ষণে তাহারা জ্ঞানবলে খড়্গ কর্ত্তরী লইয়া স্বীয় স্বীয় আবাস ভূমি প্রস্তুত করিতেছে।

"সংসার পটের তৃতীয় অঙ্কে দেবী মনুষ্যকে সভ্যতার পথে অগ্রসর করাইতেছেন। সেখানে দেবী নরনারীর

মধ্যে দাম্পত্য প্রেম সঞ্চারিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্যের মধ্যে পরিণয়প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

"কবি দেখাইতেছেন সংসারপটের চতুর্থ অঙ্কে দেবীর আর সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নাই। তিনি সেখানে মনুষ্যের মনে অপত্যস্নেহ সঞ্চারিত করিতেছেন। যতদিন পরিণয় প্রথা প্রচলিত ছিল না, ততদিন অপত্যস্নেহের প্রাবল্য অনুভূত হইত না। কিন্তু এখন নরনারী সন্তানসন্ততির প্রতি প্রচুর স্নেহ প্রকাশ করিতেছে।

"সংসার পটের পঞ্চম অঙ্কে মনুষ্যের মনে প্রথম ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উদিত হইতেছে। সংসার পটের ষষ্ঠ অঙ্কে মনুষ্য মনুষ্যকে প্রীতি করিতে শিখিতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব অঙ্কে মনুষ্য প্রত্যুপকার স্বরূপে পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে মনুষ্য মনুষ্যমাত্রেই প্রীতি করিতে শিখিতেছে। সংসার পটের সপ্তম অঙ্কে মনুষ্য পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া পরস্পর পরস্পরের শ্রম লাঘব করিতেছে। সংসার পটের অষ্টম অঙ্কে মনুষ্য দারিদ্র্য অসুরকে নিহত করিতেছে। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যতই সভ্যতার বিকাশ হয়, ততই মনুষ্য দারিদ্র্যকে পরাভূত করিতে

শিক্ষা করে। সকলেই জানেন যে সভ্যদেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।

"সংসারপটের নবম অঙ্কে মনুষ্য পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, এবং পাপের জন্য অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"সর্ব্বশেষে কবি দেখাইতেছেন যে, সংসার পটের দশম অঙ্কে মনুষ্য দুঃখ শোক তাপ প্রভৃতি সমস্ত পরাভব করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার মধুর শাসনে পরস্পর দয়ার অমৃত সিঞ্চনে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করিতেছে।

"কবি যে সভ্যতার এই দশমূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কি কেবল কবি কল্পনা? সভ্যতার এই চিত্র' যে কল্পনাবহুল, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে কল্পনা-বাহুল্য সত্ত্বেও এই বর্ণনার মূল ভিত্তি ঐতিহাসিক সত্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা। যিনি বিজ্ঞানের চক্ষে ইহাকে আলোচনা করেন, তিনি বলেন যে সভ্যতার পূর্ব্বোক্ত অধিকাংশ মূর্ত্তিগুলিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আজিও বিরাজ করিতেছে। * * * হেম বাবু দেবীর দশমূর্ত্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংযো-

জনা করিয়া কল্পনার সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সুন্দর বিমিশ্রণ সম্পাদন করিয়াছেন।"

চিন্তাশীল লেখক নিত্যকৃষ্ণ বসু মহাশয় বলেন, "দশমহাবিদ্যার কবি আত্মবিশ্বাস অনুসারে এই কঠোর (জীবন) সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি আশ্বাস দিতেছেন—

না হও নিরাশ ওরে ভক্তিমান মোচন আছে রে আপদে।

পরন্তু—

জীবজন্মে ভয় কি রে জগদম্বা জননী।

"জীবজন্ম অশেষ দুঃখের নিদান, সন্দেহ নাই। কিন্তু একদিন সে অশেষ দুঃখেরও অবসান হইবে। যতদিন তাহা না হয়, এস, আমরা জীবন মরণের অধিষ্ঠাত্রী সেই জীব-জননীর উপর নির্ভর করিয়া স্বধর্ম্ম সাধনে নিরত হই। জীবন সমস্যার এই মীমাংসা যে অতি সহজ ও সরল, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস যে 'দশমহাবিদ্যা' পাঠে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীযুবক উদ্বেল চিন্তা-সমুদ্রের কূলে আসিয়া পৌছিয়াছেন। এজন্য আমরা কবিকে আন্তরিক প্রশংসাবাদ করিতেছি। আশা করি, তাঁহার অন্যান্য

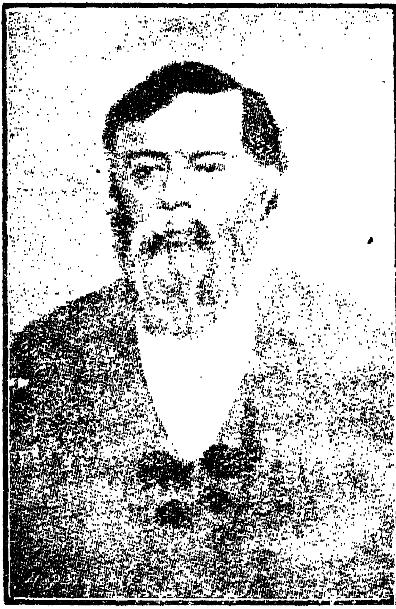
গ্রন্থ সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বিলুপ্ত হইলেও একমাত্র 'দশমহাবিদ্যা' তাঁহাকে চিরদিন বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ে অমর করিয়া রাখিবে।"

জীবন-সমস্যার আলোচনাকে কবির প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিলে হেমচন্দ্রের স্থান যে মাইকেল মধুসূদন ও নবীনচন্দ্র অপেক্ষা অনেক উচ্চে তাহা নিত্যকৃষ্ণ বসু মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৩০৫ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের অনেক অমর কাব্য প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল, তখন নিত্যকৃষ্ণ কার্লাইলের নির্দ্দেশ অনুসারে বাঙ্গলার প্রধান কবিগণের কাব্য সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই কোন প্রশ্নাত্মক বা সন্দেহাত্মক বাক্যে উপসংহার করেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় "মাভৈঃ মাভৈঃ রবে প্রসারিত করে আমাদের উদ্বেলিত হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইতে তাঁহার সাহস হয় না।"

চন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য। 'দশমহাবিদ্যা' সম্বন্ধে সুধীবর্গের যে সকল অভিপ্রায় আমরা পূর্ব্বেই প্রকটিত করিয়াছি, তাহা হইতে প্রতীত হইবে উক্ত কাব্যখানি শিক্ষিত বঙ্গসমাজে কিরূপে গৃহীত হইয়া-

ছিল। 'বান্ধবে'র সমালোচক যথার্থই লিখিয়াছেন যে "দশমহাবিদ্যা বঙ্গভাষায় এক অতি উজ্জ্বল রত্ন।" কবি স্বয়ং এই কাব্যখানিকে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া মনে করিতেন—একথা আমরা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি হেমবাবুর বন্ধুগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। কবি যে উহাকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া মনে করিতেন তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, এই কাব্যখানির প্রথম সংস্করণেই ১৫০০ সংখ্যা পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। কবিবরের রচিত আর কোনও কাব্যের প্রথম সংস্করণে এত অধিক সংখ্যক পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। কাব্যখানি ছন্দের অভিনবত্বে, কল্পনার প্রাচুর্য্যে এবং ভাবের গভীরতায় কাব্যরসজ্ঞ পাঠকগণের নিকট যেরূপ অপূর্ব্ব সমাদর পাইয়াছে তাহাতে এতৎসম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল লাইব্রেরীর রিপোর্টে সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। চন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"Still the year 1883 was distinguished above its predecessors by the receipt in



চন্দ্রনাথ বসু

the Library of some really excellent poems in Bengali. The best of them was *Dasamahabidya* by Babu Hem Chandra Banerjea. In that poem *Sakti* or Force, in its non-phenomenal form, is represented as being far too mysterious to be understood by even the mightiest intellect, and the ten forms of *sakti* called *Dasamahabidya* in the *Tantras*, are described as implying in different ways, cruelty, sternness and destruction on the one hand, and knowledge, conservation and progress on the other. The idea meant to be illustrated by the poet seems to be that which would be conveyed by the phrase *religion of force*, * which, in the opinion of some

* তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মাননীয় বিচারপতি স্যর জন উড্রফ বলেন যে force শব্দটি ব্যবহার করা সঙ্গত হয় নাই। উহার পরিবর্ত্তে power শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। প্রায় দুই বৎসর

living Bengali scholars, is the real religion of the *Tantras*. The scenes and image by

---

পূর্ব্বে তিনি এতৎ সম্বন্ধে আমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা কোনও পাঠকের উপকারে আসিতে পারে এই বিবেচনায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

The Mal
Ranchi
14. Oct. 1918.

Dear Sir,

I am glad to hear you are at a work on the life of the late Babu Hem Chandra Banerji whom both my father and self greatly respected. When he was at the Bar, I was only a junior Barrister and though I of course met him I did not know him intimately and have therefore no contribution to make by way of reminiscences. As regards his poem "Mahavidya" or rather the report from the Bengal Library thereon the writer does not appear to me to have * * * The "Shakta Dharma" is not as he says 'Religion of Force,' Force is power translated on to the material plane. We may call it the Religion of power (Shakti) if by that we mean nowhere use of force but the power which made and sustains

means of which the poet has pictured forth the idea of his poem, though of the

---

the universe with all its physical forces. Surely the "Devi" is not cruel nor likes destruction. It is said in the Sanskrit "Deva is not distroyer," man is. "Devi" recalls the universe to Herself. Still here she is cruel in the sense we use that word about man,

The "Dasamahavidya" are the tenth coil of the "Devi" known in individual bodies as "Kundalini" who has fifty coils round "Shiva." such coils representing the letters of the Sanskrit alphabet,

The ten "Vidyas" represent the three-fold "Guna" aspect of the one "Devi." "Kali" and "Tara" are "Sattvagunatmaka" and are givers of "Kaivalya" and "Tattvajnana." 'Shorasi", "Bhubaneswari" and "Chhinnamasta" are "Raja-pradhana" "Sattvagunatmaka"—givers of "Gauna-mukti" and "Svarga." "Dhumavati", "Kamala," "Bagala", "Matangi" are "Tamah Pradhana", They thus represent the three-fold "Guna" aspect of the "Adya Shkati" who in Herself is "Nirguna",

highest and sublimest kind, are conceived with wonderful vividness and power. These scenes and images are not of the earth nor of phenomenal existence, and yet they appear as real and substantial as anything that exists on the earth, so free is the poet's imagination from the tendency of lower minds to lose sight or grasp of form as they move away from the real material world. Indeed of all Bengali poets now living, Babu Hem Chandra Banerjee seems to be the one who combines with high idealism

---

I do not know how the poet dealt with the matter as I have not seen his poem.

I hope however that this note may in some degree meet your enquiry, while I remain

Yours truly

(Sd.) John C. Woodroffe,

realism of an intense kind. And in this power of presenting the ideal in all the truth, vividness and definiteness of form of the real lies his claim to be regarded as the first living Bengali poet. His *Dasamahabidya*, which is sublimity itself from the beginning to the end, is moreover, one continued stream of sweet and solemn music—a swell of sound, deep and melodious. Altogether, the work under notice is Babu Hem Chandra Banerjea's *chef d'œuvre* and *the grandest song yet composed in Bengali.*

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত